'বেঁচে-থাকা মানুষ'

প্রথম প্রকাশ ঃ

ফাল্গুন, ১৩৫৯

প্রকাশক ঃ

গৌরী ভট্টাচার্য্য

শ্রীগোবিন্দ পাবলিশার্স

১৮, নেতাজী সুভাষ রোড,

কলিকাতা-১

মুদ্রক ঃ

রবি কর

প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এ্যাণ্ড হাফটোন লিমিটেড

৫২/৩, বি, বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

সূচীপত্র

আমি বেঁচে-থাকা মানুষ

আশা করেছিলাম অনেক,
চেয়েছিলাম অনেক,
পাইনি কিছু।

ক্ষীয়মাণ জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত
টায়ার-ফাটা গাড়ীর চাকার মত
না পারে এগুতে, না পারে পেছুতে।

জীবন বদ্ধ জলা,
আলো বাতাস নেই,
অন্ধকারে কোন রকমে চোখ দুটি বের করে
নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নি।
আমার মৃত্যুকে পাশে শুইয়ে রেখে
আমি বেঁচে আছি।

ব্যথায় আসে না চোখে জল,
শোকে হই না মুহ্যমান,
অন্তর হীন প্রাণ,
তোমার স্পর্শ অনুভব করি
কিন্তু জাগে না পুলক।

গলিত পশুর দুর্গন্ধ,
নোংরা পচা জল,
তারি পাশে রাজ্যের জঞ্জাল ঘেরা
স্যাৎসেঁতে অন্ধকারময় একটা বড় চুবড়ি—
সে আমার ঘর।

বুভুক্ষু জীবন
প্রতি ভোরে জেগে উঠি,
আবার সন্ধ্যায় অনাহারক্লিষ্ট দেহটাকে
কোন রকমে রেখে দিই
ছেঁড়া চটের থলের ভিতরে।
আমি থাকি আর আমার সাথে থাকে
আমার পরম বন্ধু —অপমৃত্যু।
আমি মানুষ,
আমি বেঁচে-থাকা মানুষ।

তবুও মানুষ

রাত্রি দ্বিপ্রহর।
নবজাত শিশুর ক্রন্দন রাজপথে
আলো আঁধারে বারান্দার গা ঘেঁসে
পড়ে আছে সদ্যপ্রসূত শিশু ;
অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতা বেদনা-বিহ্বল জননী
শিশুর নিরাপত্তা খুঁজতে চাইছে
অক্ষম হাত দিয়ে।
নিশুতি রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায় –
বৈদ্য, ধাত্রী, খাদ্য
কিছু নেই।
তার সঙ্গীর দেওয়া
ভাতের ফ্যানে
দুটি জীবন বেঁচে যায়,
অনাবৃত মুক্ত প্রসূতি সদনে।

নিষ্ফল পূজা

ভগবান !

তোমার দর্শনলাভ কেউ করেছেন কি না

এ তাঁর নিজের উত্তর।

তোমার উদ্দেশ্যে

পূজা উৎসব বহুবিধ বর্ণাঢ্য আয়োজন

অগণিত অর্থ ব্যয়।

নিত্য দিনের এই পৃথিবীতে

অসংখ্য নারায়ণ,

মাথার উপর রোদবৃষ্টি ঝরা

ছয় ঋতুর আগল খোলা আকাশে

রাস্তায় ফেলে দেওয়া অভোজ্য

খুঁটে খায়।

তাদের না হয় আবাহন

না দেওয়া হয়

অন্ন বস্ত্র পুষ্প ভোজ্য

না আছে প্রতিষ্ঠার জন্য

গির্জা মঠ মন্দির মসজিদ।

পূজা হয় অদৃশ্য ভগবানের

তামসিক উৎসব।

একটা পয়সার প্রার্থনা শেষ হ'ল না

সন্ধ্যার গঙ্গা,
আকাশ কাছে নেমে এসেছে।
জাহাজের চিমনির ধোঁয়া,
ওপারে ঝাপসা বিজলী আলো।
জলের ধারে নিবিড় হয়ে বসা
তরুণ তরুণী।
মাথার উপর গাছের ডালে সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা
পাখীর কলরব।
কানায় কানায় জোয়ারের জল
জাহাজের ভোঁ, গাড়ীর হর্ণ,
ঝাল মুড়ি চিনে বাদাম
বেল ফুলের মালা।
আমার নিঃসঙ্গ একাকিত্বকে
ভঙ্গ করল একটি কাতর আবেদন
"বাবু একটা পয়সা।"
পথে ঘাটে, জলে জঙ্গলে, আকাশে
সবত্র পয়সার প্রাচুর্য,
মানুষের কল্যাণে কত আয়োজন—
তবুও একটা পয়সার প্রার্থনা
শেষ হল না।

জিজ্ঞাসা

ইজিম্-এর হানাহানি,
একই মানবজাতি বহু ইজিমের
হয়েছে সম্মুখীন।
মারামারি, কাটাকাটি, অসংখ্য জনের।
কেহ নহে বন্ধু কাহারো।
প্রত্যেকেই শত্রু প্রত্যেকের।
সুকল্যাণ মানবের যে কল্যাণস্পর্শ,
যাহা এতদিন করেছিল কল্যাণময়,
সব ক্ষেত্রে জীবনের সর্ব স্তরে,
সে আজ অতলে বিলীয়মান।
যত উপকার, সৎকার্য, বিস্মৃতির অন্তরালে,
হত্যার ভয়াল প্রতীক
মানুষের হাতে করেছে গ্রহণ
নানা রূপে নানা ছলে
আগ্নেয় ইস্পাত, লৌহ, অন্য আরও কত,
মুহূর্তে মুহূর্তে আসে
ধ্বংসের পৈশাচিক উল্লাস।
এ কি আমাদের কাম্য? এই চাওয়া?
এ কি সত্য?
অমৃতের পুত্র মানব—সবার উপরে,
না মানবের সৃষ্ট ইজিম উপরে তাহার?
এই প্রশ্ন প্রতি মানবের কাছে।
মানবের সৃষ্টি এই ইজিমই কি তবে
মানবাত্মার শেষ পরিচয়?

তুমি এখনও বেঁচে আছো

ভালবাসি, আগেও বাসতাম,
ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক পোড়া রুটিটাকে
যেমন খুঁড়ে খুঁড়ে খায়
আমিও তোমাকে তেমনই করেছি
ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়েছি
তোমার অফুরন্ত খাদ্যের সন্ধানে'
এখন......
কোলের শিশু,
জিলে্ জিলে্ চামড়া ঢাকা
বুকের কঙ্কালে
শাশ্বত অমৃত খুঁজে না পেয়ে
কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।
আমি দেখছি
তুমি এখনও বেঁচে আছ!

মাধুর্য বিষিয়ে দেয়

"সেলাম"
"সুখে থাক"
দুই প্রতিবেশী- -ভাব বিনিময়।
সত্তার, শঙ্কর।

সত্তারের পুকুরে মাছ ঘরের পাঁঠা,
আনাজ শঙ্করের ছেলে মেয়েরা না খেলে
স্ত্রী মুন্না বিবির মুখে উঠত না।
ওদের জন্মক্ষণে মুন্নাই ধাত্রী।
ছেলেমেয়েরা বলত 'ধাই-মা।'
সংসার বড় হয়, ছেলে, বৌ জামাই,
সকলের কাছে মা ধাই-মা বাবা চাচা
গুরুজন।
পূজা পার্বণ, ঈদ, বিয়ে, সাদি
সত্যনারায়ণ, সত্যপীর
দু বাড়ীই অভিন্ন।
এই মাধুর্য কারা বিষিয়ে দেয়?
বলে ওরা জ্ঞাতি নয়, জাতি নয়, আত্মীয় নয়
একে অপরের দুশমন।
সুরু হয় খুন খারাপি
লুন্ঠন, অগ্নি সংযোগ।
শঙ্করকে বাঁচাতে ধাই-মা বিধবা।

একটুকরো স্মৃতি

এখন যেখানে প্লানেটরিয়াম—
আগে ছিল ময়দানের অংশ জোড়া বড় বড় গাছ।
আমার কলেজ-শেষে দাঁড়াতাম; তুমিও আসতে।
হাতে খাবার 'দু'জনে গাছতলায় বসে
কত কল্পনা।

কাছের মানুষ হয়েও
কেউ কাউকে ধরতে পারলাম না।
ঐশ্বর্য ভালবাসার মধ্যে পাহাড় সৃষ্টি করল।
শুনলাম বম্বেতে বিয়ে হয়েছে
ইঞ্জিনীয়ার স্বামীর সাথে।

নানান কাজের মধ্যে ডুবে থাকলেও
মনটা বম্বের আরব সাগরের
নীল জলে ভেসে বেড়ায়।

সেদিন প্লানেটরিয়ামে—
গ্রহ নক্ষত্র সান্ধ্য আকাশের ছবির মধ্যে
'আমি', আর সেদিনের সেই 'তুমি'।

'উইলিয়াম ব্যাণ্ডো'

আমি উইলিয়াম ব্যাণ্ডে।
বৃদ্ধ প্রপিতামহ পুরুষোত্তম বন্দ্যোপাধ্যায়,
কলিকাতার পূর্বপ্রান্তে ২৫ বিঘা জমির বাড়ী।
সামনে পিছনে পুকুর, ছড়ের থামওয়ালা চণ্ডীমণ্ডপ।
সামনে বৈঠকখানা। অতিথিশালা।

চারখানা ফিটন, তিনখানা ল্যাণ্ডো;
নাম আমার উইলিয়াম ব্যাণ্ডো।

ঘোড়াশালে থাকত পঁচিশটা ঘোড়া,
জুড়িগাড়ী হাঁকিয়ে বেরোতেন পুরুষোত্তম,
সোনায় বাঁধা হাতির দাঁতের ছড়ি।

পাইক বরকন্দাজ থাকত কত সাথে;
আঙুলে তাঁর ক্লুস্টার, ডায়মণ্ড।
বিদেশ থেকে আমদানি হত কত ম্যানচেস্টার কাপড়।
পূজার উৎসবে হত নানা আয়োজন,
দেবী দুর্গার সোনার গহনা।
হাজার হাজার বস্ত্র বিতরণ।
ফিরিঙ্গী সাহেবের হলে আগমন
মদের ফোয়ারা কত হত বরিষণ,
আনুষঙ্গীক বাঈজির নূপুরনিক্কণ।
সঙ্গে সঙ্গে মস্তকে হইল অর্পণ
সাহেবের দেওয়া খেতাব 'রায়বাহাদুর'।
মুখরিত আনন্দ-উৎসবে আতসবাজি,
আরো কত বাদ্যভাণ্ড—
আমি উইলিয়াম ব্যাণ্ডো।
রাখিলেন দেহ পুরুষোত্তম
পিতামহ আসিলেন সিংহাসনে
একান্তভাবে তাকে পেয়েছে বিলিতি নেশা;
তিন বউ থাকা সত্ত্বেও
করলেন ফিরিঙ্গী বিবাহ, নাম তার লায়লা।
ভারতীয় নেটিভ থেকে হলেন সাহেব
হোম হল ইংল্যাণ্ড; দেশটাকে করেন বিদেশ।
সাহেবদের মোসাহেবে পেলেন চাকুরী
বিলিতি সওদাগরী অফিসে বড় ম্যানেজারী।
দিশি ও বিদিশি চার বউ নিয়ে
হুইস্কি শ্যাম্পেন কত শত রঙ্গে
লেগে যেত অদ্ভুত কাণ্ড—
আমি উইলিয়াম ব্যাণ্ডো।

খরচের মাত্রা যায় শুধু বেড়ে,
দেনার জালেতে তাই জড়িয়ে পড়ে,
পিতৃদেব মোর জনসন ব্যাণ্ডো।
কোন কুল না পেয়ে আসবাব জমি-বাড়ী-বিক্রীর কাণ্ড।
গেল গেল রব ওঠে বসত-বাড়ীর
নেটিভের দেশে আর মান রাখা ভার
জ্বালাতন করে যত সব পাওনাদার।

মুখ দেখানোর ভয়ে পালিয়ে বেড়ান
বিলিতির বদলে ধরেছেন দিশীর নেশা
তবুও ছাড়ে না তার, প্রতাপ দুর্দণ্ড :
আমি উইলিয়াম ব্যাণ্ডো।

বিবাহ হইল আমার, পাদ্রী গীর্জায়
রেভারেণ্ড ঘোষের কন্যার সাথে
সূর্য অস্ত গেলেও নাম তার যায় না।
তেমনি আমাদের বংশমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না
কিছুদিন বাদে হল মোর পুত্র
নাম দিলাম তার আমি, পামার ব্যাণ্ডো।
ছিল হাতে সম্পত্তি ২৫ কাঠা,
কুড়ি কাঠা ছেড়ে দিয়ে, পেলাম যে টাকা
তাই দিয়ে পামারকে বিলেতে পাঠাই
আই, সি, এস্, পড়ে হবে বড় অফিসার।
ফেল করে হয়ে এল ব্যারিস্টার।
লক্ষ্ণৌ গেল সেথা আইন ব্যবসায়ে,
ব্যবসার সাথে প্রেমে পড়ে গেল এক ইহুদী-কন্যার,
আমাকে জানায়নি কিছু কখনও।

অভাব থাকা সত্ত্বেও পাতিনিকো হাত,
পাছে পামার আমাকে দিতে, পায় সে আঘাত।
তবু পামারের মনে হয় ক্ষণে ক্ষণে,
বাবার দারিদ্র বুঝি ভেসে উঠে মনে।
স্ত্রীকে বলে চুপিচুপি, দিই না বাবাকে পাঠিয়ে
পাঁচশ টাকা।
বুদ্ধিমতী সুন্দরী স্ত্রী রত্ন তাঁর,
পামারকে বুঝিয়ে দিল,
এই ভুল করনাকো আর।

পাঠালে পাঁচশত টাকা, পাপা তোমার নিয়ে নেবে,
পকেট হবে ফাঁকা।
তার থেকে আমার বুদ্ধি নাও,
দশটা টাকা পাঠাইয়া দাও। পাঠানোও হবে, আসবে ফেরত
কি মজার কাণ্ড!

হাতে খালি ভাণ্ড, সংসার শূন্য
দেহ জরা-জীর্ণ।

একখানি ঘর, পলেস্তারা খসা,
আমি থাকি এঁদো এক গলিতে,
রাত্রির আঁধারে পারিনাকো চলিতে।
হাতে খালি ভাণ্ড
আমি উইলিয়াম ব্যাণ্ডো।

জ্যাম

বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্র।
খরস্রোত জনস্রোত।
পিচগলা রাস্তার উপরে,
ভেসে চলেছে বিভিন্ন যানবাহন,
বাস, লরি, টেম্পো, রিক্সা, ঠেলা,
কাঁচা চামড়া বোঝাই মহিষের গাড়ী,
ঢাকা খোলা জরাজীর্ণ কর্পোরেশনের
ময়লা ফেলা গাড়ী, নোংরা ও দুর্গন্ধ ছড়িয়ে চলেছে।
প্রচণ্ড রৌদ্র, বাতাসে আগুনের ঝলক,
ভ্যাপসা গন্ধ।
স্রোত চলেছে,
ফুটপথের গা ঘেঁসে পড়ে আছে
পেটফোলা মরা কুকুর
ড্রেন থেকে উপচে পড়েছে ময়লা জল।
রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে
বিদ্যুৎবিহীন ট্রাম, স্রোত বাধা পাচ্ছে।
ঝাঁকামুটে ছুট্‌ছে ছুট্‌তে চাইছে আরো অনেকে
পারছে না।
মৃতদেহ কাঁধে শবযাত্রী
এগুতে পারছে না।
ট্যাক্সির ঘন ঘন হর্ন
আসন্নপ্রসবা যাবে হাসপাতালে
বুঝি আর হয় না যাওয়া।

ঠাঁই নাই ফুটপাথে।
তরকারি, ডাবের চাঙারি
বিভিন্ন পসারী, নার্শারি,
নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বেসাতী।
পাশে ডাষ্টবিন থেকে পচা ফেলে দেওয়া
খাদ্য খুঁটে খাচ্ছে কাক ও কুকুরের
সাথে মনুষ্য নামধারী জীব।
চতুর্দ্দিকে হর্ন
চতুর্দ্দিকে জ্যাম।

এরা কারা

এরা কারা?
শহরের প্রাণ:কেন্দ্রে
অর্দ্ধনগ্ন রুগ্নদেহ
রৌদ্রদগ্ধ শীর্ণকায় কঙ্কালের
অগণিত মিছিল।
বক্ষে অর্দ্ধমৃত অস্থিচর্মসার শিশু
চায় ভিক্ষা- ।
বাস, ট্রাম, গাড়ীর দরজায় দরজায়
এরা কারা?
এদের রক্তের লালিমায়
আমাদেরও কিছু আছে মিল।
অমিল, সর্বক্ষেত্রে
আমরা প্রাণহীন ভিক্ষা দিলে,
প্রাণ ভরে করে গ্রহণ।

ঈশ্বর নয়, রাজা নয়,
মানুষের রাজত্বে
অনাহারে গৃহ ছাড়া হয়ে দলে দলে
বেরিয়েছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে পথে প্রান্তরে,
বেঁচে থাকার জন্য।
মৃত্যুর সাথে লড়াই করে
এখনও বেঁচে আছে
আগামী দিনের প্রতীক্ষায়।
এরা মানুষ।

রাজনীতির শিকার

চাঁচের বেড়া,
উপরে ছেঁড়া ত্রিপল, মর্চে-পড়া টিন,
মধ্যে দুটি জীব।
জন্ম হয়েছিল মানুষের গর্ভে
ঘর-বাড়ী জমি-জায়গা ছিল।
প্রাতরাশ হত
গরম ফেনাভাতে।
খাওয়া জুটত দু'বেলাই।
এদের একজন
মানব, আর একজন মানবী।
অফুরন্ত যৌবন, অসীম ভালবাসা
ওদের দেখে গুরুজনরাও আনন্দ পেতেন—
কত হাসি।

বিকালে গাঁয়ের হাটে।
বেচাকেনা,
শীতের দিনে
নলেন গুড়ের পাটালি।
হাটফেরতা আসত
তিনপেড়ে শাড়ী।
নাইবা হল সোনাদানা,
তবু ঐ রাতেই রান্নাবান্না সারা,
দাঁতের ফাঁকের মিষ্টি হাসি।
হোক না রেড়ির তেলের প্রদীপ,
আলো আঁধারে আরও কাছাকাছি
ঐ দুটি প্রাণী।
এক নিষ্ঠুর প্রভাতে
আনন্দ-উচ্ছল মানবসন্তানকে
রাজনীতি—
ঘর ছেড়ে বের করে দিল নিরুদ্দেশের পথে
সম্বল একে অপরের।
রাস্তা অতিক্রম হতে থাকে,
গত হয় যৌবন, স্বাস্থ্য,
দেহের উপরে আছে মনুষ্যেতর কোন জীবের ছাপ
অসহায় দুটি চোখ খুঁজে আশ্রয়,
এখনও তাই চলছে।

বঞ্চিতা

আশ্রয় আত্মীয়ের কাছে।
কল্পিত অভাব,
নানা অভিযোগ,
পাঠশালে হল না পদার্পণ।
নিরক্ষরা।
নিম্ন হতে উচ্চতম সর্ব কর্ম বিনিময়ে
একটু মিষ্টি মুখ।
শিক্ষার অজুহাতে
বন্ধ হল বিবাহ উৎসব।
পারিবারিক প্রয়োজনে
নিঃশ্বাসের কোথা অবকাশ ?
বাড়ীতে দেখেছে বাসর,
নাহি পরিতাপ।
হৃদয় উত্তাপ অর্থ ছাড়া হয় না গরম ;
স্নেহ, ভালবাসা প্রেম,
অকল্পিত কল্পনা,
ঐশ্বর্য বঞ্চিতা,
অবহেলিতা,
কুমারী জীবন ঃ
বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে,
শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আকাশের পানে
নূতন আশ্রয় ?
রাজপথ
না দেবালয় প্রাঙ্গণ ?

শুভ্র পারাবত

[নেলসন মেণ্ডেলাকে উৎসর্গীকৃত]

শুভ্র পারাবত,

আমি তোমায় করিব চুম্বন,

ওষ্ঠে মোর ঝরিবে রক্ত

হয়ত ঘটে যাবে বিরাট বিস্ফোরণ।

তবু,

শুভ্র পারাবত,

আমাদের উর্দ্ধতন পুরুষের জননী, ভগিনী

হতে হয়েছিল তোমাদেরই অঙ্কশায়িনী,

সন্তান পায়নি স্বীকৃতি,

ক্রীতদাস ক্রীতদাসী।

শুভ্র পারাবত,

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ও হেমন্ত

তোমরা নহ স্পর্শকাতর,

আমাদের বন জঙ্গল

কোথাও বা মরুভূমি সরীসৃপ হিংস্র শাপদ সংকুল।

বন্ধু আমরা একে অপরের,

তার মাঝে গড়ে তুলি কাষ্ঠ তৃণ দিয়ে আশ্রয়,

আমরা তোমাদের কাছে,

কৃষ্ণবর্ণ কাক।

শুভ্র পারাবত,

আমাদের জল জঙ্গল,

ভেতরে ছিল যত সোনা হীরকের খনি

তা থেকে লুটে পুটে নিয়ে গেছ সব।
আমরা পেয়েছি পিস্তলের গুলি আর কামানের গোলা।
এখনও বেঁচে আছি,—
ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত কলেবর—
তবু মৃত্যুঞ্জয়ী।
ঐ বিষধর সর্প, হিংস্র, পশু, ব্যাঘ্র, সিংহ
বন্ধু আমাদের।
একযোগে দিব উড়াইয়া,
যেতে হবে চলে।
শুভ্র বন্ধু পারাবত,
যত রক্ত ঝরে নদী সৃষ্টি হবে,
ঐ রক্ত ঝরা নদীতীরে জন্ম নেবে আমাদেরই মাতৃভূমি।
আরও সম্পদ হবে ঐ মাতৃগর্ভে,
সোনা, হীরে আরও কত কি!
আমাদের 'কারামুক্তি' হবে সেইদিন।

অতীত

[নাটোরের রাজকুমারী জয়শ্রীকে]

অতীতের এক রাজপরিবার বিস্মৃতির সীমারেখা
হয়ে গেছে পার, সৈন্যসামন্ত অশ্বারোহী,
পদাতিক গোলন্দাজ,-সবই ছিল তার—
হাতীশালে হাতী, রাজার চড়বার।
শ্বেতমর্মরে প্রস্তুত রাজার প্রাসাদ।
গম্বুজ তার দেখা যেত, দূর দূরান্তর হতে;
প্রস্তরে নির্মিত হস্তীযূথ যেন,

ধারণ করিয়াছিল দরবার কক্ষের ছাত অপরূপ ছাঁদে।
তুচ্ছ মনে করি রাজসম্মান,
অতুল ঐশ্বর্য রাজত্ব বৈভব,
মন তার ছুটে যায় ঈশ্বরের প্রেমে,
সংসারে বৈরাগ্য আনন্দ থেকে—
পেয়েছেন পরমানন্দের ত্যাগের এক অপূর্ব উল্লাস।
'সুখ নেই রাজভোগে, শূন্য ক'রে দাও মোরে।
পূর্ণ কর তোমার ঐশ্বরিক প্রেমে, নাও মোরে কাছে তুলে,
পশ্চাতে ফেলে যাই রাজত্ব সম্মান অপূর্ব আনন্দে'।
দেশ ছেড়ে বিদেশে রাজার সুনাম,
দানের আনন্দে উল্লসিত হয়ে মহারাজ কুমার,
রাজা রাম কৃষ্ণ, সাধক ভগবান, রাজত্ব, প্রাসাদ
পারেনি বাঁধিতে যাঁকে, আনন্দে দিতেন করতালি।
হুকুম এমনই ছিল রাজত্বে তাঁহার,
কেউ যদি কখনও করে উপবাস
নগর কোটালের হবে কারাবাস।
চোরের চুরির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া;
প্রয়োজন তার যতটুকু আছে
চুরি না করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে,
রাজকোষ হতে তাকে অর্থ দেওয়া হত;
কিন্তু, কঠিন অপরাধীর কঠোর শাস্তি।
স্ত্রী জাতির অপমান রাজার বিচারে
দণ্ড তার কারাবাস হইবে নিশ্চয়॥
দেশে দুর্ভিক্ষ হলে রাজার মনে হয়
—এ অপরাধ নয় প্রজাদের।
দুর্ভিক্ষ করতে দূর, খোলা হয় রাজকোষ,

যতদিন প্রজাদের স্বাচ্ছন্দ্য-না-আসে
হুকম করে দেন, খাজনা মকুব
দারিদ্র্য করলে গ্রাস, জ্ঞানী গুণীর শিক্ষার
হবে না বিস্তার,--
গুণীজন আহারের করিতে সংস্থান,
ব্যবস্থা করে দিলেন, করে ভূমিদান।

বেশভূষা মহারাজের অতি সাধারণ,
কেবা রাজা, কেবা প্রজা, বোঝা দুষ্কর -
কালের গতির সাথে কখনও বা মিল,
অমিল যখন হল রাজার অভাবে—
রাজদণ্ড কেড়ে নিল বিদেশী বণিক।
দাক্ষিণ্য দেখাল কিছু অর্থ বিনিময়ে;
ক্ষোভে দুঃখে অর্দ্ধ বঙ্গেশ্বরী মহারাণী,
রাণী ভবানীর হল বিস্ফোরণ, অপমানে।

'অর্থের নাহি কোন তাঁর প্রয়োজন।
আমার সন্তান প্রজাবৃন্দ যত—
নির্যাতিত হবে না তারা, প্রতিশ্রুতি দাও।
আমার প্রয়োজন নাহি কিছু আর';
মহারাণীর শেষ কথা শুধু রয়ে গেছে
'দিতে চাও যাহা দাও প্রজাদের'।

রাজত্ব চলিয়া গেছে কালের গতিতে,
প্রাসাদের গম্বুজ যায় না দেখা,
পুরাতন ঐতিহ্যের ধারক বাহক হয়ে
রহিলেন, রাজ কুমারী একান্ত একা,
পৈতৃক ভবন, এই তীর্থ পীঠস্থান;
প্রদীপ জ্বালায়ে যেতে প্রতি সন্ধ্যায়।

আন্দামান

আন্দামান—

বঙ্গোপসাগরের সূর্য্য ঝলমল সবুজের হাত ছানি।

শুধু নহ দ্বীপ পুঞ্জ,

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কত সাক্ষ হয়ে আছ।

পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন ভিন্ন করি

অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা করিতে অর্জন।

কত সংগ্রামি হয়েছে শহীদ

আজ তাহা গণনার বাহিরে।

দুরন্ত পরাক্রম শালী বৃটিশের লক্ষ লক্ষ হিংস্র সিংহ

ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অসহায় অগণিত নিপীড়িত—

পরাধীন মানুষের বুকে।

বক্ষ পিঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া শোষণ করিল রক্ত,

ফাঁসিতে ঝুলায়ে ।

বে-আইনি বিচারে শাস্তির অপরাধে তাদের নির্বাসনে

করিল আবিষ্কার আন্দামান তোমাকে।

সহস্র যোজন দূরে; বঙ্গোপসাগর পার হয়ে,

আর আসতে পারবে না কোন দিন।

জঙ্গলে ছাড়িয়া দিল, স্বস্তি নাহিক তাতে।

অন্ধকার কুটুরি করিয়া নির্মাণ শুধু মাত্র

নিতে পারে নিঃশ্বাস আর সামান্য খাদ্য।

কুকুর বেড়াল সম ছুঁড়ে দিত মুখে

তবু তোমার হইল না হার।

তোমার বুকে যারা পেয়েছিল আশ্রয়
স্বাধীনতা আন্দোলনের হইয়া পুরধা,
আজ তার কেহ করে নাকো খোঁজ
পরাধীন ভারত হইল স্বাধীন।
খণ্ডিত হইয়া কত সাক্ষ করিছ বহন।
আন্দামান
আত্ম-বিস্মৃতির জাতি মোরা।
ভূলে আছি নিয়ে বর্তমান।
বহু উদ্‌বাস্তুকে বক্ষে নিলে টানি
খণ্ডিত স্বাধীন ভারতের, সর্ব জাতির তুমি তীর্থস্থান
--আন্দামান।

অমৃতময়ী

মহাশান্তির ছবি আয়তলোচন তোমারি পাশে।
লোচন পল্লবে বুঝি সুন্দরের আকর্ষণ
বৃন্দাবন হতে আসেন "শ্রীকৃষ্ণ"।
আনন্দে পাগল হয়ে করতে চুম্বন,
কি মহা আনন্দ, কি মহা শান্তি।
মধু হতে মধুময়, বক্ষ মাঝে চির যৌবন তারুণ্য
বিতরণে হয় অমৃত ময়,
সেই, যাকে করে ছিলে উপাস্য।
আমি এক হতভাগ্য, পাশে বসে আনন্দের পাই না অধিকার,
নিজের অহঙ্কার অর্থ শক্তিতে আরও হয়ে যাই উন্মাদ, অন্ধ।
নিজেকে পারি না বুঝিতে, নিজের অন্তর খুঁজেও দেখিনা।

বন্ধু, আমাকে একান্তে পেয়ে কার আকর্ষণে,
ক্ষণতরে কাছে এসে কেন ফিরে চলে যাও।
তবু তুমি কানে কানে বল আমি তো এসেছি -
তোমারি হয়ে পরিপূর্ণ করিবার দুটি অপূর্ব জীবন।
ঐ অন্ধকারে, আলোক বর্তিকা সে তো আমি।
এস কাছে মোর, থাক কিছুক্ষণ।
আরও কোন নতুন আনন্দ স্বর্গীয় সম্পদ।
আসবে আশীর্বাদ হয়ে।
নিজে অর্থের অহংকারে করি উন্মাদ।
ছুটে চলে আসি, হারিয়ে ফেলি বিচারের ক্ষমতা।
মহা আনন্দ শান্তির পরশ।
তুমি, প্রাণ ভরে দিতে আস।
আমারি অহঙ্কারে, নিষ্প্রান হয়ে ফিরে চলে যাও।
ঐ ছবি, ঐ মুখ, ঐ উষ্ম দৃটি ওষ্ঠ অধর।
বলে না কথা।
স্থির দৃষ্টে চেয়ে আছে আর ঝরে আসে আনন্দ অশ্রু
আমারি কল্যাণে।
অন্ধ আমি অশান্তির অগ্নিশিখায়, সদাক্ষণ জ্বলি যন্ত্রণায়।

স্তব্ধ পৃথিবী

পৃথিবী গতি হারিয়ে ফেলেছে।
সূর্য তাকে আকর্ষণ করে রাখতে পারছে না।
পৃথিবীর জঠরে ক্ষুধার অগ্নির লেলিহান শিখা,
দাউ দাউ করে জ্বলছে।

সর্বাঙ্গই বুঝি ভস্মস্তূপে পরিণত হবে।
তাই পৃথিবী স্তব্ধ, গতিহীন।
পৃথিবীর গহ্বর একদিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পূর্ণ হয়ে গেছে।
আর অন্যদিকে জঠরাগ্নির লেলিহান শিখা।
এ আগুন সহজে নিভবার নয়
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে পৃথিবীর যে রক্ত বেরিয়ে আসছে —
সে আগুন তাও শুকিয়ে দিচ্ছে।
এ প্রশান্ত মহাসাগরের জল দিয়েও ঠাণ্ডা করা যাবে না।
এত উষ্ম!
নিঃস্ব করে দিয়েছে —
পথিবী স্তব্ধ।

ছড়া

জীবনটা মোর হারিয়ে গেল কোনখানে?
শালুক ফোটা দীঘির পাড়ের বাঁশবনে।
সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ দাওয়া তুলসী তলায়।
সিঁদুর পরা গৃহবধূর আঁচল গলায়।
সবাই মিলে একসঙ্গে পড়তে বসা।
রাতের খাওয়ার ডাক পড়লে চলে আসা।
ঝিঁ ঝিঁ ডাকা জোনাকি পোকার আঁধার করা।
জুজু বুড়ির ভয় দেখিয়ে ঘুমিয়ে পড়া।
সকাল হলে ফেনাভাত, গাওয়া ঘিয়ে পেটটা ভরা।
ছোটরা সব বড়দের কাছে শিক্ষা করা।
দ্বিতীয় ভাগ, ফার্স্ট বুক, শুভঙ্করী অঙ্ক কষা।
একটু ভুল হলে দেওয়াল গায়ে নাকটি ঘষা।

উঁচু ক্লাসের ছেলে, পণ্ডিত মশাই সবার কাছে
নম্র হয়ে চলতে, হবে খারাপ ছেলে বলে পাছে।
পাতায় ছাওয়া পাঠশালার প্রতিটি খুঁটির সাথে
কত রকমের উপদেশ দেওয়া কাগজ ঝুলত তাতে!
মিথ্যা কথা না বলা, গুরুজনকে ভক্তি করা।
একই সঙ্গে সবাই মিলে হাঁসি মুখে আহার করা।
দুই আনা 'মাইনে পেয়ে', পণ্ডিতের যেমন শাসন
চোখ রাঙ্গিয়ে মহাস্নেহে তেমনি আবার কাছে বসান।
স্লেট পেন্সিলে হাতে খড়ি, গুচ্ছ করা তালের পাতায়
বাঁশের কঞ্চির কলম ভূসোকালি লেখা পাকায়।
ঘটনাটা এমন ঘটে— ভীষণ দুষ্টু ছেলে
মেরেছিল সহপাঠীকে কালিভরা দোয়াত চেলে।
সে কি ব্যাপার! বেতের বাড়ি পড়বে পিঠের পরে
ভয়ে জড়সড়, দাঁড়িয়ে আছে চুপটি করে।
কাছে ডেকে বলেন পণ্ডিত 'ওকে করলে হনুমান
না বাবা সবাই মিলে মলবে তোমার কান।

ছুটির পরে আমার সাথে ওর মায়ের কাছে
ক্ষমা চেয়ে নেবে, মা, দুঃখ পাবেন পাছে'।
পণ্ডিতের পাঠশালায় শিক্ষা হল যে কটি কথা
আজও তাহা মনে আমার রয়ে গেছে গাঁথা
পিতা মাতাকে ভক্তি করা গুরুজনকে সম্মান।
সবার মাঝে তোমরা সবাই গড়বে উদার প্রাণ,
মিথ্যা কথা কভু না বলা, পরের দ্রব্য না হরণ
হাসি মুখে সবাই মিলে করবে আহার গ্রহণ।
তোমরা সবাই মানুষ হবে, হবে সবার মুখ উজ্জ্বল
ভালবাসার হাসি খুশী, সকলে হবে প্রাণ চঞ্চল।

নদীর ধারে খেলার মাঠে সকল ছেলেরা মিলে
সেদিনের সেই কথা মাথায় করে নিল তুলে।
গ্রামের বিদ্যালয়ের পাঠ্য হলে সমাপন
উচ্চ বিদ্যালাভের আশায়, —বিদেশে হত গমন।
ছাত্র পড়িয়ে থেকে খেয়ে লেখাপড়া হত শেখা।
এত চাকচিক্য ছাত্রজীবনে যেত নাকো দেখা।
কলেজে ছুটির পরে মাস্টারের সাথে সাথে যাওয়া
হাঁটিতে হাঁটিতে যাওয়ার পথে আরও কত বুঝে নেওয়া।
এক, আনায় কি যে হত বিরাট জলপান।
পেটভরা, চিড়া দই তিনটি মর্তমান।
গোয়াল বাড়ীর গরুর দুধ গোলা ভরা ধান
চণ্ডীমণ্ডপ বৈঠকখানা সকলেরই প্রাণ।
অমূল্য পণ্ডিত শিক্ষাগুরু, বাবু যদু মাস্টার
ছাত্রদের চরিত্র গঠনে নাই তুলনা আর।
আরও অনেক মনে আসে, কি হবে আর বাড়িয়ে।
অধ্যাপক ফণীভূষণ, হরিমোহন, অমূল্যধন
বিনা পয়সায় পড়িয়ে দিয়ে, না ছিল উপার্জ্জন।
পুত্রবৎ স্নেহ করা মানুষ গড়ার ভগবান
অধ্যাপক, মাস্টারের হয়ে গেল অন্তর্ধান।
সবার মনে কত আশা মধুসূদন কি রবীন্দ্রনাথ।
দেশকে ওরা করবে স্বাধীন রক্ত দিয়ে পরাণ পাত!
স্বাধীনতার কেনা বেচা হয়ে গেল সারা,
জীবন মরণ যুদ্ধ শেষে হল সর্বহারা।
এখন সব গুলিয়ে গেছে আসে নাকো মনে
জীবন আমার হারিয়ে গেছে অতীত এক কোণে।

পাঁচু মিস্ত্রী

[১৯৪৭-এ কোন একটি ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া
একটি কাল্পনিক চরিত্র]

কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে
গদিতে চুপ করে তাকিয়া ঠেস দিয়ে, চোখ বুজে
লাভ-লোকসানের হিসাব করে।
লাভের দিকে পারে না এগুতে।
লোকসান আর লোকসান।
লোকসান চলে গেছে।
শীতের রাত নির্জন ঝাপসা।
—এক বছর ব্যবসায় এত লোকসান।
ভবিষ্যৎ কি? –উত্থান না পতন?
মাথাটা ঘুরে বালিশ থেকে গড়িয়ে পড়ে।
ঝালাই মিস্ত্রী পাঁচু যে কখন পাশে এসে দাঁড়ায়
'বাবু শরীর কি খুব খারাপ?'
মাথা না তুলে বলে—'না হয়েছিল!'
পাঁচুর দিকে তাকায়।
'কি হয়েছে?
জানি কারখানার সব হয়ে গেছে চুরি,
—এত টাকা লোকসান।'
পাঁচু এক-নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে।
'তুই, কি করে বুঝলি?'
'জানি বাবু, ভয়েতে বলতে পারি নি।
আপনি ভাববেন না,—

যারা করেছে ক্ষতি, তাদের হবে না ভাল।
ভাগ্য, কেহ পারে না কেড়ে নিতে।
পা-টা একটু টিপে দিই ?'
পাঁচু পা টিপে, বলে 'বাবু মানুষের কষ্ট আছে।'
'কেন তোর আবার কি ?'
'না, বলছি।'
'তোর বৌ রোজ গামছা বেঁধে ভাত নিয়ে আসে।
যা আয় করিস চলে যায় ?'
পাঁচু জিভ কেটে আঁতকে উঠে।
— কালিদাসী আমার প্রতিবেশী।
বিয়ে হয়েছিল পরাণ মণ্ডলের সাথে।
হলে কি হবে পরাণ অত্যন্ত মাতাল, চরিত্রহীন।
রোজ রাতে কালিকে মারতো,
সে দিন হাটবার, কালি আমায় এসে বলে,
'দাদা, তুমি আমাকে বাঁচাও।
আমাকে কোন রকমে এখান থেকে নিয়ে চল.'
'কোথায়' – ?
'যেখানে হয়, আমি তোমার করব না ক্ষতি---
বিয়েও করতে চাইব না।
তুমি আমার নিজের ভাই-এর মত'।
ওর কথাশুনে আমার খুব দয়া হল।
বললাম—'একটু ভেবে দেখি'।
'না, তুমি আমাকে কথা দাও,
এ অত্যাচার থেকে বাঁচাবে'।
হঠাৎ, একদিন কালি এসে বলে, 'আজ ও ভিন্ গাঁয়ে গেছে।
হয়ত না আসতে পারে।

তুমি নিয়ে চল।'

'বলিস কি?'

'হ্যাঁ, তোমার পায়ে ধরি।'

'কিন্তু, লোকে তোকে আর আমাকে কত খারাপ বলবে।'

'রোজ মাতালে হাতে মার খাওয়ার চেয়ে ও কথা অনেক ভালো।
অন্তত বাঁচতে পারব।

দাদা, তুমি অমত করো না, -- এক কাপড়ে চলে যাব।
শহরে আমার ঝি-এর কাজ, দু-মুঠো খেতে পাব, তুমি জন মজুর।
কাজের অভাব হবে না।'

পাঁচু একটু জোরে পা টিপতে টিপতে বলে -
'দুর্গার নাম করে বেড়িয়ে পড়লাম।

শহরের রাস্তায়, গাছতলায়।
কাজের অভাব হয় না; দু-জনের বেশ চলে যায়।

কিন্তু, বেশী দিন না।
দু-মাস যেতে না যেতে রাস্তা থেকে পুলিশ ধরল।
আমি নাকি কালিকে বের করে এনেছি, এই অপরাধে।
আমার কোন উকিল নেই।

কালি অনেক কান্নাকাটি করে দারগাবাবুর কাছে।
আমার পাঁচ বছরের সাজা।
থাকলাম আলিপুরে।

দিন পনেরো পরে জেল পুলিশ আমাকে বলে—
তোকে কে ১৲ টাকা দিয়েছে বিড়ি খেতে।
তার থেকে আবার পুলিশ আট আনা কেটে
আমায় দু-বাণ্ডিল বিড়ি আর একটা ম্যাচ্।
ছাগলের দল যে ভাবে তাড়িয়ে নিয়ে যায়
সকালবেলা শুকনো রুটি আর আলুসেদ্ধ দিয়ে

আমাদের দশ-পনেরো জন কয়েদীকে নিয়ে যেত।
জেল বাবুদের বাড় ঘর মোছা, বাসন মাজা, বাগান কোপানো।
একবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি রান্না করতে পার?
তোমার জাত কি?
হেসে বললাম,– কয়েদীর আবার জাত, কয়েদীরা
তো একই জাত।
যে পুলিশ আমাকে বিড়ি দিয়েছিল তার কাছে গিয়ে বলি –
আমার আর কোন খবর আছে কি?
আমার খবর কেউ নিতে আসে?
শোন পুলিশ বাবা
এবার যেদিন আসবে, তুমি যদি একটু দেখা করিয়ে দাও।
আমি বিড়ির পয়সা চাই না, সবটাই তোমার খৈনী।
দিন ১০/১২ বাদে খবর, গেটে আমার জন্য একটি মেয়েছেলে।
আমি ছুটতে ছুটতে গেলাম, 'কালি'!
কালি কাঁদছে, লোহার গরাদের ভিতরে হাত দিয়ে
আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে বলে–
'আমার জন্যই দাদা তোমার এত বিপদ।
ভগবান আমাকে কোনদিন ক্ষমা করবে না।
তুমি কবে বেরিয়ে আসবে?
বেরিয়ে আসলে, আমি এখন যা খাটছি।
তার থেকে বেশী খেটে তোমাকে খাওয়াতে পারব
ও, হো, তোমাকে খবর দিতে ভুলে গেছি।
পরশ লিভার ফেটে মারা গেছে।
দেখ! দেখ! আমার মাথায় আর সিঁদুর নেই।
তাই বলে –তুমি তোমার বোনটিকে বিধবা মনে কর না।
আমি তোমার সেই ছোট বোন কুমারি কালি।'

এইভাবে কতদিন কাটে—মাস, বছর পার করে বেরিয়ে
আসলাম।

কালি গেটের ফটকে দাঁড়িয়ে
'চল, তোমার রান্নার ব্যবস্থা করে এসেছি।'
বস্তিতে একটা ছোট ঘর।
কালি বলে, —'আমি সারাজীবন আর কিছু চাই না।
তোমার সেবা করা ছাড়া।'
ও বাবুদের বাড়ী কাজ করে আর আমি ঝালাই করি।
ইচ্ছে আছে একবার টাকা জমলে জগন্নাথ দর্শন করব।
কালি আমার বউ না—বোন।
তাই বলছিলাম কি বাবু—
কপাল কেউ পারে না নিতে,
যারা আপনাকে ঠকিয়েছে তারাই যাবে।
আমিতো মুখ্যু মানুষ, টাকার হিসাব কিছুই বুঝি না।
আপনার দিন আবার ফিরে আসবে।
তখন, আমার কথা মনে করে একটু আশীর্বাদ দেবেন।
মানুষের আদালতে কি বিচার হয়?
ভগবানের আদালতে বিচার হবেই।
রাত হয়েছে উঠুন, বাড়ী যান॥'

হারাণ পরামাণিক

[১৯৩৩-এর পল্লী চিত্র]

হারাণ পরামাণিকে, আপনারা সকলে দেখেছেন,
সরকারী রাস্তার মোড় যেখানে পূর্ব দিকে গিয়েছে,

সেখানে হারাণের বাড়ী।
প্রায় তিন বিঘা জমি, মাটির সাত চালা ঘর,
খড় দিয়ে ছাওয়া, বাঁশের খুঁটির বারান্দা।
হারাণের কত বয়স তা আর বলতে পারি না।
তবে খুব বুড়ো, সংসার বলতে ওর দুই ভাইপো—
জমিজমার কাজ।
তামাক সাজা রান্নাবান্না সবই করে।
রাস্তার গা দিয়ে বাঁশের বেড়া, মাঝখানে হুড়কো।
হারাণ বারান্দায় বসে তামাক খায়।
সাজানো আছে তিনটি হুকো,—ব্রাহ্মণ, শূদ্র, মুসলমান।
রাস্তায় লোক দেখলে হারাণ ডাকে,—'ছাতা মাথায় কে যায়?
বড় গরম, এক ছিলিম তামাক খেয়ে যাও।
সাজা তামাক আর বাড়া ভাত কেউ ফেলে না, এস।
কোন্ হুঁকো?'
কারোর কানে গোঁজা নল থাকে, হুঁকোর মুখে লাগিয়ে,
কে বা শুধু কলকে ভালো করে টানে।
তারপর ওঠবার সময় এক গেলাস জল— এই রোদে এতদূর যাবে।
হলুদ সেদ্ধ করে শুকিয়ে বিক্রী করে,—আয়,
তরিতরকারি যা হয়, চলে যায়।
মধ্যে মধ্যে কিনতে হয় চাল আর তামাক।
বর্ষাকাল এলে বিপদ।
হারাণ ধামা নিয়ে যায় বড়বাবুর বাড়ী।
বাবুর 'দিদি' গাঁয়ের সকলের দিদি, বয়স সত্তর।
'ঘরে চাল নেই দিদি।'
এলেন সঙ্গে মা ঠাক্‌রেণ।
'প্রণাম মা ঠাকরেণ, চাল নেই পয়সাও নেই।'

মা ঠাকরেণ বলেন—'তুমি বুড়ো মানুষ।
এত বড় ধামা নিয়ে যাবে কেমন করে?
আমি বরং করিমকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।'
মা যেন "ভগবতী"।
উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, লাল পেড়ে শাড়ী, কপালে বড় সিঁদুর টিপ।
হাতে কলি তামার পর সোনার পেটি-চুড়ি।
চুড়ি নোয়া, নাকে নথ কান পর্যন্ত।
সোনার শিকল দিয়ে বাঁধা।
হারাণ অনেকক্ষণ পায়ের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রণাম করে
চলে যায়।
করিম আর মধুকে দিয়ে দু-ধামা চাল পাঠিয়ে দিলেন হারাণের
বাড়ী।
আবার,—জিজ্ঞাসা করে আসতে বললেন, কতদিন চলবে?
সেইমত আবার পাঠিয়ে দেবেন।
অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দূর দূরান্ত থেকে এই পুণ্যবতী,
মা ঠাকরেণকে কাপড়, তেল, আলতা, সিঁদুর দিয়ে
এয়ো-স্ত্রীরা পূজো করে।
এখন আর সে রীতি নেই।
যারা আসে তাদের সকলকে মাছ ভাত খেয়ে যেতে হত।
এই ছিল বৌ-ঠাক্‌রাণীর নিয়ম।
এত কাপড়।
গ্রামের দুস্থ মানুষদেরকে বিলিয়ে দিতেন।
নিজের জন্য কিছু নয়।
হাঁড়িতে অন্তত দশবারো জনের ভাত থাকবেই
গ্রামে কোন অতিথি এসে অভুক্ত ফিরে যায়,
তবে যে বৌ-ঠাকুরাণীর দেশের অকল্যাণ হবে।
বেলা পড়ে এলে, বাড়ীর কাজের লোকের খাওয়া হয়ে গেলে,

তারপর নিজের খাওয়া,—হোক না তিনটে চারটে।
বাবু প্রশ্ন করলে বৌ ঠাকুরাণী বলতেন,—
আমার প্রয়োজন কতটুকু, ওদের অনেক দরকার।
ওদের আশীর্বাদ পেলে তবেই আমার ছেলেমেয়ে মানুষ হবে।
মহা অষ্টমীর ভোর বেলা।

মা ঠাকুরাণী চান করে আসছেন
হারাণ ছুটতে ছুটতে এসে প্রণাম করে বলে,—
সারা জীবন তো খাওয়ালে,
শুধু তোমার পেটে জন্মাইনি তোমার কত সন্তান মা।
কত স্কুলের ছেলেমেয়ে তোমাব কাছে খেয়ে পরে মানুষ হয়ে যাচ্ছে।

মা এই লালপাড় কাপড়খানা আজ তুমি পরবে।
আমার মা দূর্গা তুমি,—হারাণ প্রণাম করে।

কিছুদিন বাদে হারাণ অসুস্থ হয়।

বৌ ঠাকুরাণী ছেলেদের বলেন, 'তোমরা পালা করে সেবা করবে।
দেখ, যেন বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়।

কবিরাজকে বলবে,—সে যেন তার কাজ ঠিক মত করে যায়।
তার ঔষধের দাম আর রুগী দেখবার টাকা পেয়ে যাবে।'

হারাণ থাকল না—
যাওয়ার সময় কম্পিত হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে বলল—
একবার মা জননীকে দেখতে পেলাম না।

একটু শাসন

। একটি ঘটনা অবলম্বনে।

স'ত বৎসরের মাতৃহাবা পুত্র, পিতার একান্ত আদরের।
যত কিছু আবদার অভিযোগ পিতাব নিকট,
অপূর্ণ রহে না কিছু।
বয়স বাড়তে থাকে বালকের যত,
পিতার বার্ধক্য আরও আসে কাছে।
যত কিছু আলোচনা ঐশ্বর্য্য অর্থেব
পিতা পুত্রে হয় সমাধান।
দিন আসে দিন চলে যায়
এক অনাবিল আনন্দ ধারায় কাটে দু-জনাব।
না বেশী দিন নয় ঘটে অঘটন।
আসিল অজন্মা, জমিতে ফসল নাই
পাটের দাম ৭ টাকা থেকে ২ টাকা মণ।
মনের মানবতায়, অভাব করে না স্পর্শ
দীর্ঘ মাইল ব্যাপি নদীর চব।
জোয়াবের প্লাবনে ডুবে যায়, কোথা ধান?
বাঁধ নেই, সংস্কারের অভাবে গেছে ভেঙ্গে।
কি করে বা দেওয়া হবে সরকারি কর
নির্ধারিত দিনে সূর্যাস্তের পুর্বে, প্রজারা খাজনা দিতে অপারগ।
আদায় নেই; উপায় কি?
জুলুম করা একবারে নীতির বাইরে
তাই ঘরের যা কিছু ছিল জমা
কর দিতে হয়ে যায় শেষ।

দিন থাকে না বসে, কালের প্রবাহে নদী বহমান।
পুত্রের পর কনিষ্ঠ দুটি কন্যা,—বয়স এগিয়ে চলে।
চোদ্দ বৎসর একের হলে অতিক্রম—পিতার মাথায় হাত.
কোথায় অর্থ কোথা বা পণের টাকা?
সম্বন্ধ যা এসেছে কমপক্ষে দু-হাজার দিতে হবে পণ।
কুলিন জমিদার পাত্র—।
সোনা ঘরে যা আছে, তা থেকে হতে পারে কিছু।
৫২ বৎসর পূর্বের ঘটনার,—
আজও হয় নাই কোন পরিবর্তন চালচিত্রের।
বিবাহে গহনার কিছু অভাবে, বৈবাহিকতার বিনিময়ে—
প্রাপ্ত হল ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, উপহাস—সম্বন্ধ ছেদ।
বাকি আছে বিরাট বাঁশবন,—বিক্রী হলে ৩০০/৪০০ টাকা।
দু-আনা মজুরে চরে বাঁধ হবে, লাগবে ২ মাস।
পুত্রের আপ্রাণ চেষ্টায় হলও তাই
পিতার আনন্দ আর ধরে না, মা লক্ষ্মীর আগমন কতদিন বাদে।
তাই লক্ষ্মীর সাধ দেওয়া হল চরে পক্ক ধানে।
যেমন—বাঙালী ঘরে ছেলের লেখা পড়ার সঙ্গে কবিতা, অভিনয়
এ যে রক্তের নেশা, তার ছিল না ব্যতিক্রম
পুত্রের আবদারে একটা নৌকা হলে—
সরস্বতীর হবে আরাধনা, অপূর্ণ রইল না।
২/১ টা কবিতা যদি ছাপা হয় কোনো পত্র পত্রিকায়,
পিতার আনন্দ কে দেখে।
নদীতীরে কালিবাড়ীর নির্জন স্থানে,—
পুরোহিত স্থান করে দেন বালকের কাব্য আরাধনার।
প্রতি সন্ধ্যায় পাঠ সমাপনে পিতা পুত্রে নানা গল্প।
পিতার কোলে পুত্র শুয়ে আছে।

প্রশ্ন হল পিতার, আচ্ছা আমার থেকে তোমায় পৃথিবীতে —
কে ভালোবাসে?
বাবার গলাটি জড়িয়ে ধরে বলে সে কি!
তুমি তো সবার উপরে, তুমিই তো ভালবাস আমাকে।
তবে যে শুনছি কে একটা মেয়ে তোকে ভালোবেসেছে,
একি সত্যি?
পুত্র চুপ, পিতার বাহুতে রয়েছে মাথা।
হাত দিয়ে গলাটি জড়িয়ে আছে
চুপ করে থেকে দেয় উত্তর—না, কিছু নয়।
ভালোবাসার পর্ব হল শেষ।
শাসন নয়, শুধু স্নেহ, সৃষ্টি করে বালকের চরিত্র গঠন।

ইন্দ্রাণী

'মুখটা চেনাচেনা মনে হচ্ছে'
দুজনে একটু থমকে দাঁড়াল,—একে অপরের দিকে
'কে'? 'ঠিকতো মনে করতে পারছি না।
আজ থেকে বহুদিন পূর্বে সত্য বলে একটা ছেলেকে চিনতাম,
বুড়ো হয়ে গেলেও, মুখের ভাবটাতে একটু মিল আছে।
—আচ্ছা চলি, কিছু মনে করবেন না।'
'একটু দাঁড়ান, —আপনি ঠিকই ধরেছেন আমিই সত্য;
ও তুমি! আরে কত বুড়ো হয়ে গেছ, কত পরিবর্তন হয়েছে।
তুমি যে এত পুরাণো দিনের বন্ধুকে মনে রেখেছ—
এ যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে তা আর কি বলব।
চল,—দুজনে একটু বেঞ্চিতে বসে গল্প করা যাক।'

অনেকক্ষণ ধরে দুজনে দুজনকে ভালো করে দেখে—
এই দেখাটা আমি ভাষায় লিখতে পারছি না।
সে কি এক অনুভূতি, আমি আর সত্য।
আমি ওর পিঠে হাত দিয়ে বলি,—'তোর খবর বল।'
'কি আর! তুই তো জানিস,—আমি আর বিয়ে-থা করিনি।
তোর সেই "ইন্দ্রাণীর" কথা মনে আছে?'
আমি অনেকক্ষণ ভেবে বলি,—'না ঠিক মনে করতে পারছি না।
'তোর সময় আছে'? তা হলে একটু বলি।
কিন্তু, ভয় হয় তুইতো ছোটবেলায় কবিতা-টবিতা লিখতিস।
আমার গল্পটা নিয়ে একটা কাব্য করে ফেলিস, বল্লেই—
দুজনে হেসে উঠলাম।
আমি বললাম 'সত্যিই যদি তুই ঠিক মতো বলতে পারিস,
তাহলে হয়ত বিরাট বিয়োগান্ত প্রেমের কবিতা হবে।'
'ক্লাস টেনে যখন পড়ি তখন আমার সাথে পল্লবের পরিচয় হয়।'
সে এক ঘটনা, যাই হোক—।
সেই থেকে আমি পল্লবের বাড়ীতে যাই।
ওর মা, বাবা, ছোটবোন সকলের সাথে পরিচয় হয়,—হয় প্রাণের ঘনিষ্ঠতা।
আমার তখন কতই বা বয়স হয়ত সতোরো কি আঠারো।
কোনো ভালোমন্দ রান্না হলেই পল্লবের মা নিমন্ত্রণ করতেন।
আমি যেতাম, থাকতাম।
ইন্দ্রাণীর তখন ১৫ বছর।
কখন জানি না দুজনে দুজনকে ভালোবেসে ফেলেছি,—
কিন্তু কেউ ধরা দিই না।
এমন কি ও বাড়ীর কেউ বুঝতে পারে না।
গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী গিয়ে খুব ইচ্ছা হল একবার ওদের বাড়ী যাই।

তখন বিকেল হয়েছে,—আমি ঢুকতেই উমাকান্ত বাবু বললেন—
'জানো সত্য তিন বছর আগে রথের মেলা থেকে কলমের আমগাছ
কিনে এনেছিলাম,—৬টা আম হয়েছিল।
কাক পক্ষীতে খেয়ে যায় বলে,—ভালো করে কাপড় দিয়ে বেঁধে দিই।
কিন্তু চোরের নজর এড়াইনি।
আমগুলো রেখেছিলাম ঠাকুরের ভোগ দেব বলে তারপর—
আজ সকালে সেগুলো চুরি হয়ে গেছে'।
আমি করুণ দৃষ্টিতে উমাকান্ত বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে—
—আসি ?
উমাকান্ত বাবু বলেন,—'যাও বাড়ীর ভেতরে যাও'।
দোতালার সিঁড়িতে উঠতেই ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা, কেমন আছ,
বাবা কি বললেন ?
'ওঁর গাছের আম চুরি হয়ে গেছে ঠাকুরকে দিতে পারলেন না,'
'খুব দুঃখের কথা'।
'তা কেন হবে ? বাবা রেখেছিলেন বাবার ঠাকুরকে দিতে।
আমি ভোরবেলা সেগুলো তুলে আনি,-আমার ঠাকুরকে দেওয়ার জন্যে'।
ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে তাকাতেই দেখি,—
ওর চোখ দুটো আনন্দে চঞ্চল ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।
সেই দিন আলো আঁধার সিঁড়িতে আমার ও ইন্দ্রাণীর প্রথম স্পর্শ।
বুকের ভেতর কি অব্যক্ত স্পন্দন।
আজ তার নিঃশ্বাস আমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে এক হয়ে রয়েছে।
সত্যর চোখে জল।
আমি বললাম, 'একটু বস, আমি এত ব্যস্ত নই'।
'শুনছিস, না—আমিই শুধু বকে যাচ্ছি' ?
'না,—শুধু শুনছি না, ভাবছিও'।
'বল'—
'ভালোবাসায় ভবিষ্যৎ কি হতে পারে,

তখন আমার সে চিন্তা করবার বয়স আসেনি।

প্রায়ই কাজে অকাজে পল্লবের খোঁজে ওদের বাড়ীতে যাই।

দেখা হয় ইন্দ্রাণীর।

দুজনে আরও কাছে এসে যাই।

বড়দিনের ছুটিতে আমি গেলাম।

সত্য বলে,—দেশের শীত তোর মনে আছে? কি হাড় কাঁপুনি।

ওর কাকিমার কে মারা গেছে অশৌচ চলছে।

ইন্দ্রাণী বলে,—তুমি যেওনা,—

আমি একটা ডুব দিয়ে এসে তোমায় খিচুড়ি করে দিই'।

আমার জবাবের প্রতীক্ষা না করেই।

পল্লব বোধহয় একটু বুঝতে পেরেছে।

'আমাকে বললে—দেখ সত্য, ইন্দ্রাণী ছেলেমানুষ হতে পারে

তুই তো ওর থেকে বড়, ও যদি কোন ভুল করে, তুইও কি করবি?

আমি আর পল্লব একটা ঘরে শুয়ে।

ও আমাকে বোঝায়!

পল্লব বলে, –'তুই কাঁদছিস?

তা হলে ঐ ছোট্ট মেয়েটাকে কি করে বোঝাব'!

ভোর হলে পল্লবের মা-বাবাকে প্রণাম করে ইন্দ্রাণীকে বলে চলে আসি

অনেক দিন যাই না।

বাড়ীতে একই মেয়ে।

বিয়ের সম্বন্ধ আসলে মত দেয় না।

বাবা-মা কিছু বলতে পারেন না, সত্যর পড়া এখনও শেষ হয় নি।

ছেলে সরকারী চাকুরে, দেশে জমিজমা।

আর আপত্তি ওঠে না।

কলকাতায় আমার হোস্টেলের ঠিকানায় একখানা চিঠি।

"আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, তুমি এই দিন আসবে।

আসার সময় আমার জন্য ভালো সিল্কের কাপড় আনবে।

আর একজোড়া গোড়ের মালা—

"ইতি—ইন্দ্রাণী"।

কণে সাজানো কিছুতেই ইন্দ্রাণীর মনের মত হচ্ছে না।

প্রায় সন্ধ্যা ৭টা বাজে।

আমি কাপড় আর গোড়ের মালা নিয়ে আসতেই,

ইন্দ্রাণী বলে—'এসেছ, মালাটা দাও।

একটু দাঁড়াও—'।

কাপড়খানা পরে সবার সামনে মালাটা আমার গলায় পরিয়ে দিল।

সে দিন আমি পাগল হইনি।

ইন্দ্রাণীর বিয়ে হয়ে গেল।

দ্বিরাগমনে ইন্দ্রাণীর শরীর খারাপ বলে ২ দিনের দিন ফিরে আসল।

মাকে বলল, পেটে অসম্ভব যন্ত্রণা,-

মা ভীত হয়ে পড়লেন।

ইন্দ্রাণী পুকুরে চান করতে যায় কলসী নিয়ে।

আস্তে করে কলসীর মধ্যে জল ঢুকিয়ে ডুবে গেল।

যখন ওকে পুকুর থেকে তোলা হল, ওর ব্লাউজের মধ্যে আমার ফটো।

সত্য একখানা ফটো বের করে আমাকে দেখায়।

ওর চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরে।

ফটোটা আস্তে আস্তে ভিজে যায়।

সব তাঁরই ইচ্ছে—

'এই তো আমার জীবন'।

ডাক্তার

ডাক্তার সান্যাল, এম. ডি.।

ছোট্ট একটু ফলকে দরজার ধারে লেখা।

বেলা দ্বি-প্রহর থেকেই দূর দূরান্তের রোগীদের আগমন।

ঘরের স্থান সঙ্কুলান,—না হলে রাস্তায়।

ডাক্তার দেখেন সন্ধ্যা ৬ টা থেকে রাত্রি ৯ টা।

পারিশ্রমিক মাত্র ২ টাকা।

অর্থের থেকে রোগীকে নিরাময় করাই পরমার্থ বলে মনে করেন।

এমনি একদিন, ডাক্তার বললেন,—

আমি যাঁর ছাত্র তিনি আমাদের অপত্যস্নেহে পড়াতেন।

শুধু তাই নয় আমাদের যা প্রয়োজন তাও মেটাতেন।

তাঁর আদেশ ছিল—ডাক্তার হয়ে মানুষকে সেবা করা।

একটা অমূল্য প্রাণ,—তোমাদের চিকিৎসা করে ফিরিয়ে দিতে হবে।

নিরাময় করতে হবে, তবেই সার্থক হবে বিদ্যার সাধনা।

আমি তোমাদের কাছে থাকব না, —

আমার কথাটা ভুলে গেলে আমার আত্মা তৃপ্তি পাবে না।

আমি এঁরই শিষ্য।

আপনাদের যতটুকু সেবা করতে পারি, সেইতো আমার লাভ।

ডাক্তার নিজেই তাঁর এই স্বল্প আয় থেকে ঔষধ পথ্য

হাসি মুখে দিয়ে যান।

সেদিন ভীড়টা একটু বেশীই ছিল।

হঠাৎ এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে বললেন,— "ডাক্তারবাবু"।

ডাক্তার উত্তর না দিয়েই একাগ্রমনে রোগী দেখে চলেছেন।

বৃদ্ধ উদগ্রীব হয়ে বললেন আবার—

ডাক্তার ইশারা করে বললেন, বসতে।

রোগী দেখে শেষ হতে প্রায় ন'টা।

ঔষুধের প্রেসক্রিপসন শুধু নয়, সাথে আহারের তালিকাও আছে।

যদি তার সামর্থ্যের বাইরে হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে টাকাটিও।

এবার হেসে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন,—বলুন কি বলবেন?

বেগম সাহেবা বহুত অসুস্থ, বয়েস অনেক হয়েছে

তাই আনতে পারলাম না।

আপনি যদি দয়া করে একবার আসেন।

এতরাতে! কতদূর যেতে হবে?

বেশী নয়, বড় রাস্তা থেকে মাত্র দেড় মাইল ভেতরে।

আপনার তো গাড়ী আছে।

চলুন,—ঠিক আছে।

সহকারীকেও সাথে নিলেন।

ব্যাগে যা যা নেওয়া প্রয়োজন সবই।

বাড়ীটা নিস্তব্ধ—লোকজন নেই, একটু ভয় হল

চিন্তায় দ্বিধাগ্রস্ত—ঢুকবেন কি না।

তাছাড়া রাস্তা থেকে অনেক দূর বস্তির ভেতরে।

আসুন ডাক্তারবাবু, ভয় নেই।

কি দাঁড়িয়ে রইলেন যে?

ভেতরে আসুন, বুড়ো মানুষ আমি আপনার ক্ষতি করব না।

ঘরের ভেতরে যেতেই মস্ত বড় পালঙ্কে শায়িতা এক বৃদ্ধা।

চেয়ারটা এগিয়ে দিতেই বসে অনেকক্ষণ দেখে।

আগে যোগাযোগ করেননি কেন? এখন তো প্রায় শেষ

সময়, তবু দেখি কিছু করতে পারি কিনা।

এঁর আত্মীয়স্বজন সব কোথায়?

লিখতে গিয়ে—নামটা কি লিখব?

বৃদ্ধ কেঁদে ফেলে বললেন,— নাম চলে গেছে, উনি বেঁচে আছেন।

—তবু নাম তো চাই।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বৃদ্ধ বললেন,—লিখুন "বেগম সাহেবা"।

ডাক্তার প্রেস্ক্রিপশন, পথ্য তালিকা দিয়ে বললেন,—

ঔষধগুলো আজ রাত্রে না পেলে!

বলেই,—নিজের ব্যাগ থেকে কয়েকটা ট্যাব্লেট বার করে দেন।

এইগুলো সাতদিন খাওয়াবেন।

রোগী কেমন থাকে আমাকে জানাবেন।

কতদিন এই অবস্থায় আছেন?

নিরুত্তর।

পারিশ্রমিক ৪ টাকা। সে কি! এতদূর আসলেন?

তা কি হয়েছে, তার জন্য তো আমাকে বেশী পড়তে হয়নি।

'চার টাকাই যথেষ্ট'।

ডাক্তারবাবু আপনাকে কি করবো,— সেলাম না প্রণাম!

ওঁর আত্মীয়স্বজন থাকলে, -আসার জন্য জানিয়ে দিন।

একটা মাত্র ছেলে আমেরিকায়, মেয়ে বিলেতে।

কে আর মার খবর রাখে,—তবু আমি তার পাঠাচ্ছি।

ডাক্তার কি চিন্তা করছিল আমি জানি না।

হঠাৎ প্রশ্ন, কি চিন্তা করছেন ডাক্তারবাবু? বাঁচবেন তো?

না, আপনি যে বেগম সাহেবা বললেন,—

তাই ভাবছিলাম কোথাকার বেগম সাহেবা?

বলব, ডাক্তারবাবু, আজ রাত হয়ে গেছে।

ডাক্তারের মনে পড়ে ছাত্র অবস্থায়।

এক বেগমের পুত্র-কন্যাকে সে পড়িয়েছিল।

আজ তা অতীতের অন্ধকারে ডুবে গেছে, যাক সে কথা।

আজ তার শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছে।

—একদিন যার সবছিল তার আজ ঔষধ কেনার অর্থটুকু নেই।
হঠাৎ,—কয়েক দিন পর বৃদ্ধ ভদ্রলোক উর্ধ্বশ্বাসে এসে বললেন ;—
ডাক্তারবাবু,—বেগম সাহেবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।
তার চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসে।
মৃত্যুর পূর্বে একটাই অনুরোধ করেছিলেন,
আমার কবরে ডাক্তার যেন এসে একটু-মাটি দেয়।
আশ্চর্য্য এই পৃথিবী, আশ্চর্য্য এই বেঁচে থাকা মানুষ।
জীবন নিয়ে যুদ্ধ করে চলেছে অবিরত॥

ঐ গাছটা

উদ্যানের কোন এক প্রান্তে অযত্নে লালিত বৃক্ষশিশু।
কখন অঙ্কুর হতে হয়েছে বাহির, কেহ নাহি জানে।
গ্রীষ্মে হয়নি জল সেচ, প্রকৃতির দেওয়া জলে,—
সূর্য্যের কিরণ যতটুকু পায়,—তাই নিয়ে দিনে দিনে বাড়ে।
বাতাসে বাতাসে আন্দোলিত হয় পত্র শাখা যত।
প্রকৃতির সাথে খেলা করে কেটে যায়,—আনন্দমুখর বৃক্ষবাল্যকাল।
আসে কৈশোর,—
বসন্তের আগমনে নব পল্লব দক্ষিণ বাতাসে যেন পাগল হয়ে,—
করে খেলা।
আদরিণী মেয়ে যেন দোল খায় চুল এলাইয়া।
বর্ষার আগমনে পায় নব-যৌবন।
উদ্দাম হয়ে উঠে আকাশের পানে
বেড়ে যায় শত সহস্র শাখা পল্লব,
আসে কুঁড়ি, ফোটে ফুল, মৌমাছি ভ্রমরের কত গুঞ্জন।

নেই যে সময় তার নিজেকে দেখার
সে শুধু বিলিয়ে যায়,—
আনন্দ সৌরভ সবার মাঝারে আর ভ্রমরার পাখায় আনন্দ হিল্লোল।
কত যে দিয়েছে ফল, কেহ নাহি জানে
কার্পণ্য করেনি কভু, করেনি বিচার
তবু মনোরথ পুরে নাই আকাঙ্খিত জনের।
হেমন্ত জানিয়ে যায়—
শীতের হিমেল হাওয়া আসছে এখন;
পাতাগুলি পড়ে যাবে, পত্র পুষ্প ফলহীন।
রুগ্ন তনু দেহখানি রইল দাঁড়ায়ে
না পায় চোখের জল না পায় আদর
শুষ্ক এক কাষ্ঠ খণ্ডে পরিণত হয়ে,
কাঠুরিয়ার জ্বালানির অপেক্ষায়।

আমি

আমি—
চলতে চলতে চলার শেষ হয় না।
বহু পথ পেছনে ফেলে এসেছি।
চলবার পথে হারিয়েছি কৈশোর, স্বাস্থ্যজ্জ্বল যৌবনের সুন্দর মুখশ্রী
আমি—
সেই মন ভুলানো আমার কথা সব হারিয়ে গেছে।
ভ্রমর কৃষ্ণবর্ণ চুল, নয়ন ভুলানো রূপ।
ভুল করেও ভুলে যেত মধুর হাঁসিতে।
আমি—

কি দেখছ?
এ আমিতে হাসি নেই, রূপ নেই, প্রেম নেই, প্রাণের স্পর্শ নেই,
আছে শুধু একটা অর্ধমৃত জীব—আমি।
আমার চলবার পথ যা ছিল কুসুমাস্তীর্ণ
ফুলের গন্ধে ভরা কল্পনার জাল দিয়ে ঘেরা
দুঃখ প্রকাশের ছিল না অবকাশ।
এখন অনুভূতির বাইরে,—"একটা আমি।"

রেঙ্গুনের কারা অন্তরালে

মুক্ত রণাঙ্গন নহে, নহে যুদ্ধ ক্ষেত্র
শত শত নিরস্ত্র বন্দি বদ্ধ লৌহ কারাগারে।
বিচার হল না তাদের নির্বিচারে গুলি করে
হত্যার তাণ্ডবলীলা এক বীভৎস উৎসব।
সভ্যতার কোন্ যুগে করিতেছি বাস,—জানি না।
এ বোধহয় ছাড়িয়ে যায় আদিম বর্বরতাকে।
পৃথিবী কোথায় এগিয়ে গেল?
কোন সঙ্ঘ, ভ্রাতৃত্ব, প্রেম আছে কি হেথায়?
সভ্যতার আলোক নিভে গেছে।
বিষাক্ত সর্পের স্ফলিত জিহ্বা,
বিষ উদ্গার করে ছোবল মারছে সদাই,
এই শোষিত পৃথিবীর নিরীহ প্রাণীকে।
নেই বিচার, নেই কোন দয়া,—প্রাণের আবেগ
ক্ষমতার উত্তুঙ্গ শিখরে লোভ লালসায় ডুবে যায় সব।
অমূল্য এ জীবনের মূল্য নাহি দেয়।
কোথায় পরিণতি? সমুদ্রের অতল তলে, নাহি নিস্তার॥

"ভুল"

আমি যখন থাকব না, তুমি আমায় ভাববে কি?
হতে পারে না, এত বড় মিথ্যা কথা ভাবতে পারি না।
ভুলে যাওয়া মানুষের এক চিরদিনের নেশা।
নতুন নতুন আনন্দেতে ভুলে যাওয়ার পেশা।
ইচ্ছা থাকলেও হৃদয়ে তার মেলেনাকো স্থান
কেমন করে রাখবে মনে বলতো আমায়?
সত্য আমি তোমার কাছে হয়ে যাব ম্লান।
তুমি যেমন ভুলে গেছ কত অতীতকে।
আজ তাকে বলতে গেলে বাজবে ব্যথা বুকে।
এমন করে থাকবে ভুলে যাবে নাকো বলা
ভুলে থাকার আনন্দে যে নাইকো ছলা কলা।
ভালোবাসা স্নেহ প্রেম সবই মস্ত ভুল
মনে রাখা বৃথা কষ্ট পুরোণো হয় নির্মূল॥

কাছে নিতে পার না

কখনও চাইলে যা পাওয়া যাবে না,
তারই কথা চিন্তা করে আনন্দে পাই আত্মতৃপ্তি।
কাছে পেয়েছি, আরও কাছে যারা,—
হৃদয় হতে আপন বলে মনে করি প্রতিক্ষণে,
অগ্নিতে দগ্ধ লৌহ শলাকা।

সর্ব অঙ্গে বিঁধিয়ে দেয়,—যন্ত্রণায় কাতর।
চোখে আসতে পারবে না জল।
দগ্ধ গাত্র, প্রলেপে ঢেকে রাখি
যন্ত্রণার রক্তিমশিখা, না করি প্রকাশ
চলতে হয় সম্মুখের পথ—
সহযাত্রী কাউকেও দেখতে পাই না, নিঃসঙ্গ একা।
কে আমি? কিবা মোর পরিচয়?
স্বামী, আত্মীয়, বন্ধু—না।
মিথ্যা এ অন্তরের আবাহন,—প্রাণহীন।
কিন্তু কোথা সেই অন্তরতম,
কেন এতটুকু স্থান করে দিতে পারি না?
কোন একটি অন্তরের অন্ধকার কোণে
কি সেই বাধা, কেন এই হীনমন্যতা
তবে কি সকল মনুষ্যত্ব হয়ে গেছে চিরতরে বিলীন?
কি আশ্চর্য আমি!
নিষ্ফলতায় পরিপূর্ণ জানি।
এ পল্লবে আর ফুটবে না ফুল, শুধু অন্ধকার।
ফিরে যেতে চাই সেই অন্তরে,—অন্তর বাঁধিয়াছি যেথা।
আমার প্রাণ মন স্নেহ মায়া মমতা হয়েছে বলিদান।
যেথায় থাক যত দূরে তুমি।
নাই কি ক্ষমতা তোমার করিতে আকর্ষণ?
লহ বন্ধু, লহ ফিরে, সেই চিরপরিচিত হৃদয়ে,—
হৃদয় দিয়ে ফিরায়ে আমায়।
নিষ্পেষিত, অবহেলিত, অনাকাঙ্খিত এই পৃথিবীতে আমি।
দাও মুক্তি, নাও কাছে।

তোমায় প্রণাম

"হে নয়ন অভিরাম, তোমাকে জানাই প্রণাম,
এ কি আনন্দ অবিরাম, হৃদয়ে এসেছে মহাপ্রাণ।
তুমি আনন্দ, তুমি মহাশক্তি, মহাশান্তি,
তোমাকে পাওয়ার কল্পনা নিয়ে, দূর দূরান্ত থেকে ছুটে এসে,
পথ মাঝে হয় ভ্রান্তি, তুমি মহাশান্তি।"
দুঃখকে দিয়েছি দুঃখ, ব্যথাকে আরও ব্যথা,
ভয় পেয়ে সব চলে গেছে, না বলে কেহ কোন্ কথা।
বুকের মাঝে চাওয়ার আনন্দ জেগে রয় অণুক্ষণ
অনুভব নেই, নেই কোন স্পন্দন।
"হে মহা আনন্দ তুমি নিষ্ঠুর, নাই করুণার কোন ছল,
তোমাকে করি প্রণাম, ওগো প্রেম কল্যাণ।
বুকের মাঝে আগুনের জ্বালা জ্বলে যায় অবিরাম।
কি নিষ্ঠুর, করুণাঘন, আনন্দ অভিরাম।
তোমাকে করি প্রণাম।"

লহ নমস্কার

খেয়া পারের নৌকা এসে গেছে, যেতেই হবে পারে।
পয়সা গুণে নিয়েছে মাঝি, ডাকছে বারে বারে।
দাঁড়িয়ে ছিলাম একা একা, কেউতো কভু বলেনি কথা
নৌকাতে পা বাড়াতে যাব, ডাকছ কেন আর?

বেঁচে-থাকা মানুষ

এ পারের যা ভালোমন্দ, কাঁটায় ক্ষত দৃষ্টি অন্ধ
রক্তঝরা দ্বিধাদ্বন্দ্ব, রেখে গেলাম এ পারেতে, নাইকো কিছু আর।
ফুল ফুটাতে পেরেছি কি? দুঃখের মাঝে একটু হাসি?
পেরেছি কি দিতে আমি, ফুলের মধুর গন্ধ?
সেইটুকু নিয়ে থেক ভুলে, যেতেই হবে যাব চলে
সবার কাছে গেলাম রেখে জীবন ভরা দ্বন্দ্ব।
মনে কি আর পড়বে আমায়, এবার তবে নিলাম বিদায়,
স্রোতের জলে বইছে হাওয়া, খেয়া পারাপার
মাঝি বৈঠা নিয়ে গান তুলেছে, খেয়ায় উঠি

—লহ নমস্কার॥

ইন্দ্রনীল

ইন্দ্রনীলের অভিনয় দক্ষতা এমনই—
মঞ্চে আবির্ভূত হলেই যেন দর্শক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত।
যেমন সুঠাম দেহের গঠন, তেমনই বাচনভঙ্গী,
বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও বন্ধুত্ব - পারিবারিক যাতায়াত।
তার আন্তরিকতা একান্ত আপন করে নেয় বোধহয়—
"আমি অভিভূত"
এই ইন্দ্রনীলের সঙ্গে বহুদিন সাক্ষাৎ নেই।
আমার এক বন্ধুর কাছে শোনা—
ইন্দ্রনীল সৈনিক বিভাগে যোগদান করেছে।
প্রায় ত্রিশ বৎসর পর ইন্দ্রনীলের সাথে হঠাৎ দেখা।
কিন্তু,—
চেহারায় সে বুদ্ধিদীপ্ত ছাপ নেই, কন্ঠস্বর কর্কশ, ক্রোধরাগত চক্ষু।

আমি চিনতে না পারলেও, সে আমাকে চেনা দিল।
অনেক দিন বাদে আগমন, প্রয়োজন কিছু অর্থের।
আমি অবাক এবং হতবাক!
প্রত্যুত্তরে অপেক্ষা না করে বলে,—দাও টাকাটা খুবই প্রয়োজন।
সম্ভব হলে শোধ করব,—না হলে নয়।
বেরিয়ে যেতে গিয়েও আবার ফিরে আসে—
জীবনটা হতচ্ছাড়া, চাকরী যা ছিল ছাড়িয়ে দিয়েছে।
একটাই কারণ "নেশা"।
গৃহিণী থাকলেও গৃহচ্যুত।
আর প্রয়োজন আছে কিছু বলবার?
মনে কর সংসার পরিত্যক্ত ভাঙ্গা মৃৎপাত্র
আসি—
প্রয়োজন হলে আবার কিছু দিও, পাওয়ার আশা না করেই।
চিন্তা করেও খুঁজে পাই না, কেন এই অবস্থা ইন্দ্রনীলের?
নেশা, না আরও কিছু? সৈনিকের চাকরী?
হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায়
আর ফুটপাতে শুয়ে থাকতে পারছি না'রে।
তোর বারান্দায় একটু শুতে চাই, আপত্তি আছে?
না, দেখছি।
দু-তিনদিন কাটবার পর,—আমার প্রশ্নের জবাবে বলে
গৃহে স্থান হলে কি আর ফুটপাতে মানুষ পড়ে থাকে?
তুমি দুটো খেতে দাও, এখানে থাকছি, এই পর্য্যন্ত।
একান্ত আকাঙ্খায় জিজ্ঞাসা করি—
তোমার বাসায় আমাকে নিয়ে যেতে পার?
আমি জানতে চাই।
কিছুক্ষণ বাদে জবাব দেয়—
আমি যাব না,—তবে বাসাটা দেখিয়ে দেব।

শীর্ণকায় ভদ্রমহিলা সর্বাঙ্গে বৈধব্যের ছাপ

ইন্দ্রনীলের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাই ;

পরিচয় বলতেই, —আমি ইন্দ্রনীলের স্ত্রী ছিলাম।

কি বিশ্বাস হচ্ছে না ? বসুন –

দু'টি ছেলে আর ঐ সেলাই কলটা দেখতে পাচ্ছেন ?

সেলাই করেই আমাকে ছেলে দুটোকে মানুষ করতে হয় ।

মেয়েটির বয়স ২২, আমি আর কি বলব ?

আমাদের স্বামী-স্ত্রীর কোন সম্পর্ক নেই।

নাকে দড়ি দিয়ে গরুকে লাঙ্গল টানবার সময় যে ভাবে চাবুক মারে,

ঠিক সেইভাবে,—আমার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত।

মাইনে হলেই সবটাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

চলে যায় নেশায় আরও কত কিসে ! নাই বা বললাম।

দিনের পর দিন উপবাস। নাই শিক্ষা সন্তানের।

এই সেলাই কল চালিয়ে সংসার আর

এদের লেখাপড়া খুব সামান্যভাবে চালাতে হয় ।

দেখছেন তো, –আমার বাঁ পায়ের আঙ্গুলটি নেই।

টাকার জন্য বুটের গুঁতো দিয়ে আঙ্গুলটি ভেঙ্গে দিয়েছে।

অস্ত্রোপচার করে বাদ দিতে হয়।

পিঠের জামাটা তুলব ? দেখবেন, কত ক্ষত আছে।

মদ্যপ চরিত্রহীন স্বামী, স্বামী বলব না—

লোকের দিবারাত্র অত্যাচার, বলতে লজ্জা লাগে।

বয়সে যতটুকু রূপ ছিল,

সেটাও সে অন্য লোকের কাছে ভাঙ্গাতে চায় ; সহ্য করতে পারিনি।

ছেলেরা যদি বাবা না বলে, আমি তাকে কি বলতে পারি ?

আর আশ্রয় !

ভুলে যেতে হবে বিবাহ-বন্ধন যদি উদ্‌বন্ধন হয়।

আর বলতে পারছি না।

আপনাকে আজ আপ্যায়ন করবার মত কিছুই নেই।

আচ্ছা আসি।

নমস্কার।

রামলোচন

রামলোচনের জন্ম দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ পরিবারে।

মাটির ঘর আর কিছু জমি—

তাতে কোন মতে হত গ্রাসাচ্ছাদন।

টোলের গুরুর কাছে বাল্যেতে হল তার শিক্ষার পত্তন।

গুরুর পাঠ্য ছাড়া বালকের হয় আরও অনেক।

গুরুদেব আদর করে বলেন,—"বালককে"।

ভবিষ্যতে হবে তুমি মহাবিদ্যাবান্।

অন্য সব ছাত্র হতে বালক স্বতন্ত্র।

আপনার মনে থাকা কি এক স্বভাব।

বাল্য অবস্থায় গুরুগৃহে পাঠ হল সমাপন, নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্বে

উচ্চবিদ্যা আর কোথায় বা হবে মেধাবী পুত্রের।

পিতার হল দুর্ভাবনা, তা হলে রাম কি হবে না পণ্ডিত?

নির্জন নদীতীরে বৃক্ষের ছায়ায় কাটে দিন-গুলি।

একলা থাকার এক উদগ্র প্রয়াস।

দিব্য-জ্যোতির দর্শন লাভ হয় বালকের।

ভবিষ্যত বাণী নির্ভুল,

পৌরোহিত্যে নাহি কোন আকাঙ্খা

নির্জ্জন একাকীত্ব একান্ত প্রিয়ে বসে।

কৈশোর উত্তীর্ন হল
সুন্দরী বালিকা বধূ পিতৃদেব আনিলেন ঘরে।
যৌবনেও রামচন্দ্রের হয় না আকর্ষণ
অসামান্য সুন্দরী বধূটির প্রতি।
গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে রামলোচনের নাম পড়ল ছড়িয়ে।
ভবিষ্যত বক্তা এক জ্যোতিবিদ বলে।
এই কথা, দেশের মহারাজার হয় কর্ণগোচর।
নবরত্ন সভামাঝে চাই দ্বার পণ্ডিত।
রামের পড়ল ডাক রাজসভা থেকে
পিতা, মাতা, স্বামী-স্ত্রীর কি যে দুর্ভাবনা
পণ্ডিতের গণনা না যদি মেলে গর্দান যাবে তার।
রামলোচন নিশ্চিন্ত; আসলেন নবরত্ন মাঝে।
রাজসভা শুরুতেই হল পরিচয় মহারাজার সাথে
করজোড়ে প্রশ্নের অপেক্ষায় দাঁড়াল রাম।
সভামাঝে গুঞ্জন, — রাজার প্রশ্নের দিতে পারবে কি উত্তর?
ঘোষণা করেন রাজা, রাজদরবারে প্রয়োজন আছে দ্বার পণ্ডিতের।
রাজসভা হবে অলংকৃত।
উৎসুক নয়নে সবাই চান মহারাজার দিকে।
রামলোচনের যাবে গর্দান অথবা পাবে কয়েকটি পরগণা।
মহারাজার প্রশ্ন রামের নিকট —
কাল প্রত্যুষে কোন দরজা দিয়ে হবেন বাহির?
রামলোচন তৎক্ষণাৎ একটি ভুর্জ্যপত্রে লিখে বললেন,
মহারাজ আছে এক অনুরোধ,
এই পত্রটুকু থাকবে মহারাণীর লোহার সিন্দুকে,
কেউ যেন না দেখে লেখা।
কাল প্রত্যুষে রাজ দরবারে হইবে প্রকাশ,

রাণীমাতার স্বহস্ত থেকে।
চিন্তায় রাত্রিতে রাজার নাহি আসে ঘুম।
কোন দরজা দিয়ে শয়ন কক্ষ হতে হবেন বাহির?
মাথায় আসল—এক উদ্ভট কল্পনা।
পূর্বের দেওয়াল ভেঙ্গে হবেন বাহির।
রাত্রিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে পূর্বের দেওয়াল ভেঙ্গে হল সুরঙ্গ।
মহারাজ হবে বাহির কাল প্রত্যুষে।
নিশ্চয়ই যাইবে গর্দান রামলোচনের।
রাজসভা আরম্ভ হল অত্যন্ত উল্লাসে,
মহারাজ মহারাণী সহ হলেন আসীন রাজ সিংহাসনে।
প্রচার হয়ে গেছে, মহারাজ দেয়াল ভেঙ্গে হয়েছেন বাহির।
রাজসভায় উৎসুক সকলে, রামলোচনের কি হবে উপায়?
কোষাগার রক্ষকের হল আদেশ -আসল ভুজপত্র।
উল্লাসেতে যেন ফেটে পড়ে রাজসভা,—
অতি সন্তর্পনে মহারাণী পত্রটি খোলেন
যেভাবে মহারাজ হয়েছেন বাহির ঠিক সেই মত
আছে লেখা ঐ পত্রটিতে,—মহামন্ত্রী করিলেন পাঠ।
মহামূল্য মুক্তার মালা মহারাজ পরালেন রামলোচনকে,
হল উপাধি রামলোচন সরস্বতী।
অর্পিত হল তাঁকে ২টি পরগণা।
রামলোচনের নাম হইল "বিলোপ"
'সরস্বতী' নামে হলেন পরিচিত।
কপোতাক্ষ নদী তীরে পায়ে চলা পথ।
সুবর্ণ বণিক চলে বাক্স ভরে, বাণিজ্য সম্ভাব—
চুড়ি, বালা, কন্ঠহার, শঙ্খের বলয়।
স্নানঘাটে এসে তার হল দর্শন,—সদ্যবিবাহিতা সৌন্দর্য্য অনুপম—

কার কন্যা বুঝতে পারে না।

কাছে এসে বণিককে বলল বধূটি,--কণ্ঠে হস্তে পরিয়ে দাও অলংকার।

বণিক অবাক হয়ে দেখে, দিব্যজ্যোতি দেহ থেকে বালিকার হয়

বিচ্ছুরিত।

বাক্স খুলে ধরে সম্মুখে দেবীর, তোমার পছন্দ মত পর আভরণ।

মূল্যের প্রশ্ন হতে হল উত্তর, -

পিতা মোর বিখ্যাত সরস্বতী ঠাকুর মূল্য যা' সকলি পাবে সেথায়।

মুহূর্তের মধ্যে কন্যার ঘটে অন্তর্ধান।

বণিক উপস্থিত হয় ঠাকুরের কাছে

কন্যার অলংকারের মূল্য করিতে গ্রহণ,

ক্ষণতরে সরস্বতী ধ্যানস্থ হলেন।

বিশ্বজননীর হয় আবির্ভাব মহাকালীরূপে।

প্রতিষ্ঠার আদেশ পান ঐ স্নান ঘাটে।

গৌড়বঙ্গ হতে আসিল স্থপতি।

কপোতাক্ষ তীরে নির্মিত হলো মহাকালি মন্দির

৬০ বিঘা জমির পরে।

প্রতিদিন নিত্যপূজার হল আয়োজন।

সরস্বতী ঠাকুরের মাটির ঘর হল প্রাসাদ' পূজার মণ্ডপ।

দশমহাবিদ্যার স্বপ্নাদেশে মন্দির স্থাপিত হয়।

কারুকার্য্য মণ্ডিত অতি মনোহর

দশমহাবিদ্যার মূরতী প্রকোষ্ঠে তাহার।

নানা দেশ, গ্রাম থেকে হয় আগমন কত মানুষের

সরস্বতী ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণে।

একটাই কথা তার, আমার নেই কোন অধিকার

তোমাদের করবার জ্ঞান বিতরণ।

প্রত্যেকের মাঝে আছেন ঈশ্বর নিজেই।

সংযত হৃদয় মনে নিবিষ্ট হলে,

নিশ্চয়ই ফল লাভ হইবে তাহার।

বিদ্যা, দীক্ষা জ্ঞান কখনও না হয় বিক্রয়।

তোমরা নিজেরা নিজে হও জাগ্রত

ব্রাহ্মণ কভু দান করে না গ্রহণ।

জীবনে আমার যা মিলেছে পুরস্কার, তাতেই পরিপূর্ণ আমি।

আর ঋণ বাড়াতে না চাই।

একদিন দেখা গেল, এই তপস্বী তাপসের হল অন্তর্ধান।

শত বর্ষ পূর্ণ হয়ে গেছে কেউ তার পাইনি সন্ধান।

প্রাসাদ রয়েছে ভগ্নস্তূপ হয়ে চণ্ডী মণ্ডপ।

দশ মহাবিদ্যার মন্দির, বট অশ্বত্থ বৃক্ষ

বন-জঙ্গলে ঢেকে রেখেছে সব—

কালের কপোলে, কপোতাক্ষ তীরে।

ফুলের বাগান

ছোট বেলা থেকেই ফুলবাগানের শখ

নানা রকমের ফুলের গাছ গোলাপ, বেল, জুঁই আরও কত কি!

মনে হয় ফুলের গাছগুলো আর ফুল ওর সঙ্গে কথা বলে।

বাগানটা পুকুরের ধারে–

ও যখন থাকে তখন জলসেচ হয় ঠিক ঠাক্।

কিন্তু, না থাকলে মালী যত্ন নেয় না, গাছের অকাল মৃত্যু।

কলেজের ছুটি হলে এসে যখন বাগানের অবস্থা দেখে,

তখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে

এইফুল বাগানই ওর প্রাণ —তারই যত্ন হয় না।

গ্রীষ্মের ছুটিতে এসে,—এ কি! বাগানের কি অপূর্ব চেহারা।
সব গাছগুলো যেন ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে।
অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়িয়ে গাছগুলো দেখে।
গাছগুলো ভালো আছে তো? কেমন দেখলেন? পিছু হতে বলে —।
মুখের দিকে তাকিয়ে, আমি তো ঠিক চিনতে.........
প্রায় দু-মাস হল পাশের আত্মীয়ের বাড়ী।
বাগানটা এত ভালো লেগেছে যে যত্ন না করে পারিনি।
বাঃ কি সুন্দর।
সকালেও গিয়ে দেখে মেয়েটি বাগানে ঘুরে ঘুরে গাছে জল দেয়,
আগাছা উপড়ে, আরও কত কি।
খুরপিটা আমাকে দিন, আপনি পারবেন না, ও নরম হাতে।
বসে বসে মাটি কাটে আর পেছন থেকে দেখে
এত যত্ন বোধ হয় নিজের করতে পারেনি।
আমি যাই,
আমার গাছগুলো বোধহয় আমার থেকে তোমাকে বেশী ভালবাসে।
দেখ, দেখ, গোলাপটি কি সুন্দর!
গোলাপ না তুমি?
তুমি গোলাপকে সুন্দর করেছ বলেই না, সুন্দর হয়েছে।
নিয়ে যাও পড়বার টেবিলে রেখে দেবে।
পড়তে বসে গোলাপ আর ওর মুখখানা,
এক হয়ে বই-এর পাতায় ভেসে উঠে।
আবার বাগানে সন্ধ্যার সময় দেখা।
কথাবার্তা যতটুকু হয়, তার থেকে বেশী হয় অন্তরের বিনিময়।
ছুটি ফুরিয়ে এসেছে, এবার যেতে হবে।
সন্ধ্যায় বাগানে গিয়ে গাছগুলোকে বসে বসে আদর করে
আর নিজের মনে কি বলে।
হঠাৎ,—পেছন দিক দিয়ে এসে চোখটা চেপে ধরে –

দুই গণ্ডে দুইটি চুম্বন।

কিছু ভুল করলাম না কি?—বলেই হেসে উঠে।

রাগ হল তো? তুমিতো জান কাল আমি চলে যাব।

যাওয়ার আগে এত ভাবনা চিন্তা নিয়ে আমাকে যেতে হবে।

তুমি থাকতে পারবে তো?

ভোর হতেই ওকে যেতে হচ্ছে ওদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে।

একবার ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে বলে

কই আমাকে তো আদর করলে না?—

এই চিঠিটা দিলাম পড়ে দেখো।

কি আছে চিঠির ভেতরে, সারা রাস্তা খুলবার সাহস হয়নি।

শুধু মুখে হাত দেয় আর আদরের ছোঁয়াটুকু লেগে আছে মুখে।

গিয়েই প্রথমে চিঠিটা খুলে দেখে —।

"তোমাকে কি বলে সম্বোধন করব জানি না, —বন্ধুই বলি।

আশাকরি তুমি রাগ করবে না।

গত সন্ধ্যায় ঘটনা আমার মনের বাইরের কিছু নয়।

অনেক কাজের ভেতরে হয়ত তুমি ভুলে যাবে।

আমি তোমার বাগান, তোমার ফুল আর তোমাকে

একই সঙ্গে ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

যাক সে কথা—

ছোট বেলায় আমি পিতৃ-মাতৃহীন, কাকার কাছে মানুষ।

দু-মাসের জন্য এসেছিলাম তোমারই পাশের বাড়ী,

আমারই কোন আত্মীয়ের কাছে।

আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে; বয়স বেশী নয়,— তৃতীয় পক্ষ।

আমার পুত্র, পুত্রবধু, কত বড় সংসার—সেই জীবনেই আমি যাচ্ছি।

তোমাকে যা দিয়েছি, তা আর কেউ পাবে না।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা,—তুমি ভুলে যেও।

ইতি—"স্নেহলতা"।

অর্দ্ধশতাব্দী অতিবাহিত

সৌরভ অবসর গ্রহণ করে কলকাতায় ভদ্র হোটেলে থাকে।

আজ ফুলবাগান নেই, বাবা নেই, দেশ নেই একমাত্র ভ্রমণের নেশা।

এমনি একবার বেরিয়ে পড়ল রাজস্থান হয়ে মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা।

বৃন্দাবনে একটি মন্দিরে বৃদ্ধা নিজের মনে করে কীর্তন।

শুভ্র কুঞ্চিত কেশ, অপূর্ব কণ্ঠ।

কখন কীর্তনের সুরে নিজের দেহ দুলিয়া উঠে।

একবার ঠাকুরের মূর্ত্তি আবার কীর্তনরতা সেই বৃদ্ধা

দর্শন করতে করতে মনে অতীতের এক চেহারা ভেসে উঠে।

ভুল হচ্ছে না তো, বলে নিজের মুখে নিজেই হাত বোলায়।

এ কি সেই ছোটবেলার স্নেহ?

এবার পাশে বসে সঙ্গীত শেষে প্রশ্ন করে,- আপনার পরিচয়?

বৃদ্ধা হেসে জবাব দেন তপস্বী জীবন।

আপনি তুমি, সৌরভ নও তো?

আমি কি ভুল করছি? তুমি ঠিকই ধরেছ!

দুজনে উঠে দাঁড়ায়।

কোথায় আছ? প্রশ্ন করে সৌরভ।

সে অনেক গল্প, চল হাঁটতে হাঁটতে বলি।

অনেক অত্যাচারের পর কলকাতায় এসে একটা হাসপাতালে
নার্সের চাকরী।

তাতে যা টাকা পয়সা পেলাম, এখানে একটা আশ্রমে থাকি।

যাবে আমার আশ্রমে? ছোট্ট ফুলের একটা বাগান করেছি।

একটু হেসে উত্তর দেয়—কোন্ আশ্রম?

যখন আমায় বাঁধতে পারনি তখন তোমার কাছে কি প্রয়োজন?

এখন এই ভবঘুরে জীবনই বেছে নিয়েছি।

আর ছোট বেলার অতীত স্মৃতির ভেতর নিজেকে ডুবিয়ে।

যাক্, তোমার ঠিকানাটা আমাকে দেবে ?

আমার ঠিকানা তো আমি, আর তোমার ঠিকানা তো বুঝে নিলাম।

আমি,—আর সেই অতীত দিনের দুষ্টুমী আর করিব না।

একটু দাঁড়াও, গাছের ফুল রোজ আমি ঠাকুরকে দিয়ে আসি।

এই নাও দুটি গোলাপ।

হাতে নিয়ে একবার গোলাপ আর একবার ওর মুখের দিকে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে যায় মিলিয়ে।

অনুভূতি

অনিন্দ্য সুন্দরী যেন উর্বশী সম

প্রস্তর গাত্রে খোদিত কিন্নরী যৌবনা।

নিবিড় চুম্বন দিয়ে এঁকে দিল ছবি।

রাতের প্রথম প্রহরে —

যৌবন জল প্লাবনে বাঁধ ভেঙ্গে যায়—

আছড়িয়া পড়ে ওর মুখে, ওষ্ঠে গণ্ডে আর চিবুকে।

কি যে, সে এক অনুভূতি!

নাহি আসে নয়নেতে ঘুম, ঘর্মসিক্ত দেহ।

নাহি বিছানা নিজের হাতের উপর মুখ রেখেছিল।

এ পাশ ও পাশ করে উত্তীর্ণ রাত্রি দ্বিপ্রহর।

একটু নিদ্রার ছোঁয়া পড়িয়াছে নয়নের পাতে,

আবির্ভাব হল মহাকবি কালিদাসের-সুকোমল কান্তি দেহ,

অনন্ত যৌবন, মহাকবি-কি দিব্য জ্যোতি!

চরণ ধরিয়া ও পড়ে মুরছিয়া।

নয়নের জলে ধৌত হয় কবির চরণ যুগল।

করুণ কন্ঠে করে নিবেদন--

চুম্বনের অনুভূতি প্রকাশ করিবার ভাষা দেহ মোরে।

যতটুকু ভাষা ছিল আমার থলিতে ফুরাইয়া গেছে সব,

তবু আমি নাহি পারি, প্রকাশ করিতে কিবা সেই অনুভূতি।

তোমার শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, মেঘদূতে কত চুম্বনের অনুভূতি

করেছ প্রকাশ, অমর মধুর ছন্দ পরিপূর্ণ প্রাণ।

কিছু মোরে দাও, কর না নিরাশ।

দুঃখ পোষ্য শিশু, অনুভব শিহরণ প্রাণের

আবেগে আমি যা বলিতে পারি নাই -তুই পাবি কোথা?

নয়নের জল শুধু পড়ে রয় মহাকবি কালিদাসের চরণযুগলে।

ধীর পদক্ষেপে প্রেমের মহান কবি কৃষ্ণগত প্রাণ।

বিদ্যাপতি আসিয়া আদর করি -

বৎস আমি যতটুকু অনুভব করিয়াছি, বলিতেছি তোমা—

"জনম অবধি হাম রূপ ও নেহারিনু

নয়ন না তিরপিত ভেল

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখঁলু

তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥"

ঘুম ভেঙ্গে গেল, উঠিল লাফিয়ে

না, —এতো ব্যারিস্টার সাহেবের দোতলার বারান্দা।

হাতের উপর মাথা, চোখের জলে হাত ভিজে গেছে।

হাঁ বাবা নেলী এসেছিল,

আমাকে...............

বারান্দায় আয়নায় সামনে যেয়ে নিজেই লজ্জিত;

এই মুখ!.........

এটা নেলীর উন্মাদনা, না-আশ্রয়দাতা সে।

ওকে নিয়ে করিতে চাহে খেলা।

১৯৩৫ সালে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে

ঘর ছেড়ে বাহিরের পানে টেনে নিয়ে যায়।
কোথায় বঙ্গদেশ আর কোথায় বা লক্ষ্ণৌ।
সামান্য চাকরী হল ব্যারিস্টার সাহেবের কাছে
খাওয়া থাকা মাসে ১০্ টাকা।
কর্ম সাহেবের সাথে সাথে যেতে হবে কোট কাছারিতে
কাগজ পত্র নিয়ে।

এ পটের পরিবর্তন নাহি, চলে কিছু দিন।
সাহেবের একমাত্র কন্যা অতীব রূপসী নেলী।
আড় চোখে বুঝে নেয়, দৃষ্টি তাঁর তাহার উপরে
স্বাভাবিক নিয়মে, কাছে পাওয়ার ছিল আকাঙ্ক্ষা, ক্ষণতম
অন্তরের কোণে।

দাগ মুছে যেতে লেগেছিল প্রায় ৭/৮ দিন
প্রভাত হতেই ওঁদের বাড়ী থেকে হইল বাহির
আরও কোন্ আশ্রয়ের আশায়।
প্রতিদিন এক টাকার বিনিময়ে হল স্থান একটা হোটেলে
খাওয়া স্নান করা ছাড়া যতটুকু সময়
বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুণে
নিদ্রায় মুখখানা ভেসে উঠে নেলীর –
ধনীর একমাত্র কন্যা কিন্তু তার আশ্রয়দাতা?
চিরদিন বাহির অন্তরে তাহার এই অহংকার
ভালবাসায় স্থানকাল পাত্র নাহি করে বিচার।
মোহতে আকৃষ্ট করে সে এক মরীচিকা!
যদি এ স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়?
মরীচিকা পরিণত হবে বিরাট মরুভূমিতে—
নাহি রবে প্রাণ নাহি কোন্ সৃজনের ক্ষমতা—
শুধু রুক্ষতা আর ধূলি ঝঞ্ঝা।

নেলীর এই ক্ষণিকের আকর্ষণ, চাওয়ার ভুল
যদি ভেঙ্গে যায়, তখন তার অস্তিত্ব রহিবে কোথায় ?
রাস্তায় চলতে চলতে, একদিন তো প্রায়—
ঠেলা গাড়ী চাপা পড়ার হয় উপক্রম।
গালমন্দ খেতে হয় ঠেলা চালকের কাছে।
এইভাবে চললে হইবে মৃত্যু।
প্রায় ২০ দিন বাদে তুমুল দ্বন্দ্ব বহি হৃদয় মাঝারে
উপস্থিত হয় সাহেবের বাড়ীর ফটক সম্মুখে।
সাহেব গাড়ী থেকে নামতেই ব্যাগটা চেয়ে নেয়—
কোথায় ছিলে এতদিন ? না, মানে শরীর হয়েছিল খারাপ।
এখানে থাকলে আপনাদের হইত বিপদ তাই—
চল, পরে কথা হবে।
নিয়ম মাফিক জল খাবারের হয় না কোন ত্রুটি।
যে ভয়ে এতক্ষণ ছিল সন্তর্পণে আবির্ভাব হইল নেলীর।
হ্যালো, নিখিলেশ - Where have you been so long ?
Really a mad man you are ! Not a Child
কোন কিছু না বলে,—
You think, না, তোমাকে কোন কথা বলতে চাই না।
কি হয়েছিল তোমার ?
My dad told me you were sick, Did you think
we are জন্তু বা heartless ?
আমাদের কোন দয়া নেই, মমতা নেই তোমার উপরে.
মানুষ মানুষকে ভালো বাসবে না, আমি তোমার কি করেছিলাম ?
বারান্দায় জ্যোছনার আলোয়—
তুমি হাতের উপরে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিলে,
কত সুন্দর না তোমাকে—Are you cold ? no sensation,
no feeling ?

আমি ভেবেছিলাম, ওঃ হোঃ, সব জিনিসটাই গোলমাল করে দিলে।
আমি জানতে চাই তুমি আমাকে ভালোবাস কিনা?
একি, কথা বলছ না কেন? কি হয়েছে তোমার?
কি বলব আপনি বোধহয় জানেন—
মাইকেল মধুসূদনের জীবনে এই একই ঘটনা ঘটেছিল।
মাদ্রাজে কোন সাহেবের কন্যা তাঁকে ভালোবাসে।
কিন্তু তার দারিদ্র ওদের বিবাহে বিচ্ছেদ টেনে দেয়।
তখন তাঁর তিনটি সন্তান।
নীরবে চলে আসেন কোন প্রতিবাদ না করে কলকাতায়।
সে রাতের তোমার চুম্বনে যে দাগ পড়েছিল তাহার মুখেতে—
মুছে গেল কিছুদিন বাদে।
বাইরের লিখন আপনাতে মিলে যায়,
কালের স্রোতে অন্তরে প্রবেশের নাহি অধিকার।
ভালো তোমায় বাসিয়াছি কিনা বুঝিতে পারি না।
তোমার আকর্ষণ, উন্মাদনা আমার অনুভূতির বাইরে।
হিম নদী যদি পারে ভারত-মহাসাগরে করিবারে অবগাহন স্নান
কৃপা দয়া অনুকম্পা গড়ে শুধু প্রেমের ব্যবধান॥

আমাকে ভালবেসো না

না,—আমাকে ভালোবেসো না।
বাইরের এই সুন্দর আবরণ
যাকে আমরা বলি পোশাক
তা দিয়ে বিচার কর না।
"না,"— আমায় ভালোবেসো না

আমার মুখের হাসি চোখের চাওয়া
তোমার তাতে হবে না কিছু পাওয়া।
তবু ভুল –
ভুল করে আমাকে ভালোবেসো না।
আমাদের আদান প্রদান অনেকবার হয়ে গেছে।
দেহ প্রাণ মনের সবই পুতুল খেলা।
ভাঙছে গড়ছে আবার খেলা
সবটাই জোড়া তালি
আমাদের একই সঙ্গে সহ অবস্থান।
খেঁকরো সাপ, সুন্দর বনের বাঘ
আর আফ্রিকার সিংহ,
কখন যে কি রূপ ধরে
আমরা জানতে পারি না।
"না," আমায় ভালোবেসো না।
সবটাই দেওয়া নেওয়া
একটু এদিক ওদিক—চুরমার সব
কি মন্ত্রণা, কি অসহ্য যন্ত্রণা।
'না,' আমায় ভালোবেসো না।

গাজন

তা-কুর, তা-কুরু, ঢোল এবং কাঁসি,
পচিশ থেকে তিরিশ জন গাজনের সন্নাসী।
গৈরিক বসন, গামছা, রুক্ষ কেশ দাম
হর-গৌরীকে ঘিরে নৃত্য করে অবিরাম।

নৃত্যের তালে তালে আনন্দে চন্‌মন্‌
—এক অপূর্ব ছন্দ।
পায়ের নুপুর করে ঝুন্‌-ঝুন্‌, ঝুন
মুখে সর্বক্ষণ বলে,—শিব মহাদেব।
এইভাবে নৃত্য বাদ্য চলে কিছুক্ষণ
হঠাৎ, 'বালাকারের' অন্য তালে শুরু হয় গান।
'বালাকার'—গাহে
এক দিনতে শূলপাণি, নন্দিকে কহেন বাণী
শুনশুন ওহে নন্দীবর!
অন্য সকলে,—ওহে শুনশুন ওহে নন্দীবর।
আমার বচন শুন বৃষটি সাজায়ে আন।
যাব আমি মর্ত্যবাসী, জীবগনে দুঃখ দেখিবার।
কি ওহে! যাব আমি দেখিতে একবার
মর্ত্যবাসী যত লোক, বড় ব্যথা দুঃখ শোক।
কত জ্বালা যন্ত্রণা কেবা তাহে জানে।
সকলে—কি ওহে, কেবা তাহে জানে
তাহাদের দুঃখ নিবারণে যাব আমি মর্ত্যধামে,
বিলম্ব করিব না আর।
সকলে—কি ওহে, বিলম্ব করিও না আর।
নন্দি ভৃঙ্গী সেজে গুজে মহাদেবকে বৃষে তুলি
যাত্রা শুরু হবে এইবার।
সকলে—কি ওহে, যাত্রা শুরু হবে এইবার।
ব্যাঘ্র চর্ম পরিধানে সর্প রাখি শিরস্ত্রাণে,
ডমরু উঠিল বাজিয়া।
সকলে—কি ওহে, ডমরু উঠিল বাজিয়া,
হেনকালে, পার্ব্বতী আসিলেন ত্বরাগতি
তাহাকেও সঙ্গে নিতে হবে।

সকলে—কি ওহে, তাহাকেও সঙ্গে নিতে হবে।

কহিলেন মহাদেব,—তোমার কত কষ্ট হবে, গেলে মর্তধামে।

পার্ব্বতী নাছোড় এবে, শিব সাথে যেতে হবে।

আসিলেন অন্নপুর্ণা, অন্ন ভাণ্ড কোলে লয়ে।

সকলে—কি ওহে. আসিলেন অন্নপুর্ণা ভাণ্ড কোলে লয়ে।

আবার ঢোল কাঁসির বাদ্য চলে।

সন্ন্যাসীরা বোম্ ভোলানাথ বলে—

নৃত্যের ছন্দে মহা উল্লাসে,

"জয়বাবা ভোলানাথ" পার কর, ধর হাত

পার হই হাত ধরে ভব দুঃখ হতে।

গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে।

সব কল্যাণ কামনা করে কর্তাবাবুদের

যাহা দেন সেইটুকু করিয়া গ্রহণ

সারাদিন উপবাস, সন্ধ্যায় হয় রন্ধন।

'জয় হর গৌরি' বলি,—হাতে দেয় করতালি

উপবাস হয় উদযাপন।

হারানো দিনের সেই শিবের গাজন আর কই;

ফিরে পাওয়ার আশা আর নেই।

চৈত্রদিনের শেষে সন্ধ্যায় জাগরণে,

মহিলাদের হত জাগরিণী গীতি, গাঁয়ের কল্যাণে,

আবাল বৃদ্ধা, বধূ, শাশুড়ী সকলে একত্রিত হইয়া

তুলসী বেদী মূলে,

মহামারী বসন্তের কোপানল হতে,

জাগরণ হত গ্রামের মঙ্গল কামনায়

মিলিত কন্ঠে নৃত্য, করতালি, মঙ্গল গান

আনন্দ মুখর হত তুলসি প্রাঙ্গণ।

একত্রে উচ্ছল সকলে, পেত সাধনায় প্রাণ।
মা শীতলা, ওলাই চণ্ডি, সব দেবদেবীর গান।
যত দূর, মনে পড়ে দুই চার কলি,
তুলে ধরে সেইটুকু বলি—
প্রার্থনার ভাষা পাওয়া যায় যাহা।
'নদীর চরের মাঝে রুয়ে এলাম ধান
মা-লক্ষ্মী চান করেন চাঁদওয়া টানায়ে
গাঁয়ের বধূ চায় বর—ধানে আর ধনে,
আর গাভীর দুধ।
লক্ষ্মী 'গো'—মা, কোলে আসুক পুত।
শীতলা আর ওলা চণ্ডি বড় দয়াবতী।
গ্রামের কোন লোকের কর নাকো ক্ষতি'
বসার শতরঞ্জি মস্তকে তুলিয়া
বিভিন্ন নৃত্যের ছন্দে হেলিয়া-দুলিয়া
গানের কামনা শুধু গ্রামের মঙ্গল।
সপ্তম দিনের জাগরণ সন্ধ্যা থেকে
সূর্য্যের উদয়,—চলে সারাক্ষণ।
নাচগান প্রার্থনার কামনা সভায়
গৃহে যেন দেবতার হত আবির্ভাব।
মানসী কলেজে পড়ে বয়সে নবীনা।
ন' বুড়িমা সকলের বয়সে প্রবীনা।
নাচের ভঙ্গীমা আরো অতি মনোরম,
জয়-পরাজয় ; প্রতিযোগিতা অতি অনুপম।
প্রবীনার নৃত্য ছন্দে হয় পরাজয়—নবীনা মানসী
ছুটে যায় গৃহ পাশে জানালার ধারে।
যেখানে ঘুমিয়ে ছিল সুখেন্দু বিকাশ
ঘুমের ভেতরে তার নাক টিপে ধরে, বন্ধ করে শ্বাস।

হঠাৎ, চমকে উঠে কর্ণে দেয় হাত
মানসী হাসিয়া বলে কি হল তোমার?
না, কিছু নয় রক্তের সংস্কার।
জান! আজ মোর পরাজয় ন'বুড়িমার কাছে,
একটাই কারণ—
যতবার জানলার দিকে চাহি
তোমাকে না দেখি আমি
অঘোরে ঘুমিয়ে তুমি,—
রাগে ক্ষোভে ব্যথা নিয়ে আমি
এ পরাজয়, তুমি কেমনে বুঝিবে?
আছে কি হৃদয় তব প্রাণের ভিতরে?

ফল পাওয়া

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি এই বৃক্ষ তলে,
আসিবে বলিয়া আমি ছিনু পথ চেয়ে।
তোমাকে পত্র লেখা বৃথা হয়ে গেল!
তাই ভেবে চলে যাব নিরাশ হয়ে।
কতটুকু পরিচয়, দু'জোড়া চোখে চাওয়া
বন্ধুর বিবাহ বাসরে ছিল না বাসনা।
চোখে চোখে এক হতে কেমন যে হওয়া
তার কাছ থেকে মন আর ফিরে আসে না।
বিবাহ সমাপন, বর বধূ গেল চলি
হৃদয়ে আমার কি যে ছায়া আঁকে
কারও কথা মনে নাহি আসে, কেমনে যে বলি
তাই পত্র লিখে ছিলাম গোপনে তাহাকে।
ক্ষণে ক্ষণে ভাবিতেছি চিনিবে না কোন দিন মোরে।

এতদূর থেকে শুধু বৃথা আসা হল
আকাশে কাল মেঘ ঘনাইয়া আসে
ঝড় জল আসে বুঝি প্রবল হইয়া
দূর থেকে দেখি, ছায়া চোখে ভাসে
ধীরে ধীরে কাছে এলে বুঝিতে পারি।
প্রশ্ন করি, পত্র মোর পেয়েছ নিশ্চয়
সংকোচ আসিল, কাছে যেতে পারি,
এতক্ষণে কথা বলে, ভয় কিছু নাই।
তোমার পত্র পেয়ে আমি হতবাক্,
বিজলি চমক যেন মাথায় খেলিল
দু'জোড়া চোখের চাওয়া হয়ে নির্বাক্
স্মৃতির পরশ পেয়ে ভাসিয়া উঠিল মনে।
এমনি করে আসা যাওয়া হয় নানা ভাবে
অজানা রহিল এই প্রেম সকলের কাছে
কথা দিল আমায় ছেড়ে নাহি যাবে।
প্রণয় আর ফাঁসি রহে না গোপন
ধীরে ধীরে লোক জানা জানি হয়ে যায়।
আমার উপর আসে কঠোর শাসন
কোন দিন আর তার দেখা নাহি পাই।
শাসন আর লাঞ্ছনা মাথা পেতে নিয়ে,
অভিসার কভু মোর বন্ধ নাহি রহে
ক্ষণিকের চাওয়া পাওয়া এইটুকু নিয়ে
কুমারী জীবন মোর চলিয়াছে বয়ে।
কতদিন কত প্রেমিক প্রেমিকা এই বৃক্ষ তলে
প্রণয়-বিরহ মধুর, তারপর আঘাত পাইয়া
বুক ভরা ভালবাসা ব্যাথা অশ্রু জলে
মেঘ বাতাস ঝড় দিবে উড়াইয়ে।

স্পর্শ

নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়, —
আঁধার নেমে আসে ধীরে ধীরে,
হলুদ রং-এর বালুকা বেলায়
সমুদ্র আমাকে গ্রাস করতে আসছে।
ঢেউ-এর পরে ঢেউ
আমি ভীত, আমি চঞ্চল,
রঙীন রশ্মি রেখে সূর্য অস্ত গেছে
আলো আর দেখিনা।
মাথাভাঙা ঢেউগুলো সমুদ্রের বুকে
জোনাকির মত জ্বলছে।
ঠাণ্ডা একটা হাত স্পর্শ করতে চমকে উঠি
চীৎকার করতেই প্রতিধ্বনি ফিরে আসে।
হিমশীতল আমার বিষণ্ণতা.—
একেবারে একা।
আমি উচ্ছল,—
সদ্যজাত শিশুর মত অসহায়।

ক্ষয়

প্রাণটা তুষের আগুনের মত ধীরে ধীরে
ধূমায়িত হয়ে একটু একটু করে পুড়ছে।
কোন পরিবর্তন নেই —।

গ্রীষ্মের বৃক্ষ ছায়ায় গরু, ছাগল, পশুরা
যেমন করে শূন্য পেক্ষনে চেয়ে থাকে,
আর করে রোমন্থন - ।
সেও নিরাশায় চেয়ে আছে।
দেহের লীলা, মন কিছু পেল না,
ধোঁয়ার আগুন আরও বেড়ে যায়।
অ-পাওয়াকে স্পর্শ করতে পারে না,—
—আগুন কোনদিন।
সত্যি কি এমনি করে নিঃশেষিত হতে হবে?
না, -নিঃশ্বাস স্পর্শ করবে না কাহাকেও
নিজেই ভস্ম হবে, —
তুষের আগুনে।

শুভরাত

ধরেছি আঁচল টেনে দেবনা যেতে,
থাকতে হবে আমার কাছে এই শুভরাতে।
এত কালের আনাগোনা, হৃদয় ভরা ভয় ভাবনা
চুকিয়ে দিয়ে একেবারে চিরদিনের তরে।
ঘোমটা তোমার খুলে দিয়ে, মুখখানিকে কোলে নিয়ে
বুকের মাঝে রাখব আমি আদর সোহাগ করে।
ফুলের মালার ফুল শুকাবে, গন্ধ সবই উড়ে যাবে,
মালা শুধু গাঁথা রবে দু'টি মনের তারে।
বাসরের এ আঁধার ঘরে, ভালবাসা সৃষ্টি করে,
দু'জনাকে চিনিয়ে দেবে হাতটি রেখে হাতে।
ছিনিয়ে নিতে পারবে না কেউ,- সন্ধ্যা, সকাল, রাতে।

চাঁদ

কত হাজার বছরের পুরাতন চাঁদ, প্রতি পূর্ণিমায়

রূপ জৌলষ নিয়ে এই পৃথিবীর বুকে হও আবির্ভূত।

প্রেমিক-প্রেমিকার অধরের ছাপ তোমার অঙ্গে লেগে আছে,

সাক্ষী হয়ে আছ,— অতীত বর্ত্তমানের।

অগণিত মানব-মানবীর প্রণয়-লীলায়।

কত বাঞ্ছিত জীবন ভালবাসায় স্তব্ধ হয়ে গেছে।

অজস্র জীবনের মৃত্যু করেছ দর্শন,— নিজেকে করে মৃত্যুহীন।

তোমার কাছে জানবার আছে অনেক,

কত দেশ, কত জাতির উত্থান পতন, চাক্ষুষ সাক্ষী তুমি

বলে যাও অফুরন্ত কাহিনী,—শুনাও মানবে॥

মালাবদল

কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়—

তোমার আমার সেদিন কত কথা।

আমায় তুমি ছাড়বে না-কো,

যতই আসুক দুঃখ ব্যথা।

আমাদের সম্মুখেতে গোড়ের মালা দু'টো কিনে

মালা বদলের পালা হয়ে গেল সেই দিনে।

কিন্তু,—

যাব কোথায়?

গৃহ?

দু'জনের যত্নটুকু আয় যায় চলে।
কিন্তু, বিপদ হল।
শহর থেকে অনেক দূরে ঘর যদিও পায়।
আসা যাওয়ার গাড়ি ভাড়ায় দেনা বেড়ে যায়।
দেখ, আমরা বোধ হয় ভুল করেছি,
ভালবাসার প্রেমের ডানা যায় খসে।
সামান্য টাকা মাইনে পেয়ে সেদিনের সেই
বিয়ের স্বপ্ন যায় ভেঙ্গে
আরও কিছুকাল কষ্ট করে দুই জনে থাকি
তা না হলে, বাবার পরিচয় রয়ে যাবে বাকি।

চিঠি

তোমাকে কি লিখব জানি না।
বলেছিলে তুমি আসবে সপ্তাহে তিনদিন।
দুটি সপ্তাহ চলে গেল, দেখা পেলাম না।
আমি তোমার বৌ—।
নিশ্চয়ই আমার জন্য, তোমার মনের মধ্যেখানে স্থান আছে
সর্ব কাজের মাঝে একটুখানি আমার মুখটা,
ভেসে ওঠে না তোমার চোখের তারায়?
আমার চেয়েও পেয়েছ তুমি অনেক ভালবাসা
প্রয়োজনটা অতি তুচ্ছ, যাওয়া এবং আসা।
কিন্তু,—আমি একটা মেয়ে।
অগ্নি-সাক্ষী করা তোমার স্ত্রী।
রান্না-বাড়ী ঘর-সংসার তোমায় নিয়ে সব।

তোমার কিসে তৃপ্ত হবে—?
তোমার আনন্দে সৃষ্টি হবে, মন হারানো প্রাণের মহোৎসব।
আমার সবটুকু নিয়েও, তুমি যদি না পার তৃপ্ত হতে।
আমায় একটু বুঝিয়ে বল।
তোমার পাওয়া, আমার দেওয়া
পৃথিবী হারিয়ে গেছে তোমার মাঝখানে।
সমান্তরাল রেখো না গো, একটু কাছে নাও।
আমাকে নিয়ে পূর্ণ, পরিতৃপ্ত হও,
কোন ক্ষোভ রহিবেনা, আরও নিবিড়– আরও, আরও।
দীর্ঘ শীতের রাত্রে চোখে নাহি আসে ঘুম।
এপাশ ওপাশ,—রাতটা কেটে যায় ।
কাছে থাক,—
শীতের রাত্রে তোমার রান্না, গরম জল সবই পাবে।
তাতেই আনন্দ—।
আর, –
আমার সারাদিনের কর্মক্লান্ত দেহটাকে লুকিয়ে রাখি।
তোমার বুকের মাঝে প্রতি সন্ধ্যায়।
পত্রখানা গেছে ভিজে, জলে নয়।

কোথা মিল

এই পৃথিবী—
তারুণ্য ভরা নিত্য নতুন সজীবতা
সৃষ্টির মহা আনন্দে উত্তাল।
কাছে ডাক—সে কি ভালবাসা, না আকর্ষণ?

আমাকে দিয়ে করাও কত কাজ।
কিন্তু, আমি পৌরুষে হতে পেরেছি কি উচ্ছল উজ্জ্বল ?
তোমার এই মহান বিশ্বে!
সৃষ্টি হয়েছে কত জীব।
পাহাড় পর্বত সমুদ্র বনজঙ্গল।
সে তো আমার পাওয়ার আনন্দে।
সত্যি কি আমি তোমাকে ভালবাসি ?
না, শুধু চেয়ে থাকা—পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়।
তোমার ধূলি ঝঞ্ঝা আমার আকাশ করে মলিন।
আর তোমাকে খুঁজে পাই না।
হয় না মিলন তোমাতে আমাতে।

প্রাতরাশ

প্রভাতে ঘুম ভেঙ্গে চন্দ্রানী,
অর্ধ জাগ্রত স্বামীর পাশে,
চায়ের পেয়ালা হাতে দাঁড়ায়
গাত্রোত্থান চায়ের পেয়ালাটা
অতি, সযতনে নেয় নিজ হাতে,
একটু গ্রহণ করে বলে,—
চা টা ভাল,—আবার চুমুক।
চন্দ্রানী এক মনে চেয়ে থাকে,
ক্ষণপরে বলে—চা টা, না থাক—।
বল না,—কি বলতে চাও ?

বলছিলাম যত আদর করে চায়ের কাপে দিয়েছ চুমুক,
এমনি করে কোনদিন—
না, বলে কি লাভ।
তবু শুনি,—
কোনদিন এই মুখে দিয়েছ চুম্বন চায়ের পেয়ালা সম?
যাই, অফিসের ভাত দিতে হবে।
তুমি চা খাও।

রমেশ পোটো

পোটো পাড়ার রমেশ পোটোর ছেলেটা ভুগছে জ্বরে,
পয়সা'ব তার ভীষণ অভাব দেখায় আউট-ডোরে।
ডাক্তার বলে ঔষুধ-বিষুধ ভাল খাবার চাই,
অসুখটা তার বেজায় খারাপ,—চিকিৎসা যার নাই।
কথা শুনে রমেশ পোটোর মাথায় হাত পড়ে,
চোখের সামনে জল-জ্যান্ত ছেলে বুঝি যায় মরে!
হাসপাতালে ভর্তি হতে অনেক খরচ আছে,
ফল-মূল আর পথ্য নিয়ে কে যাবে তার কাছে।
গত বছর কালী ঠাকুরের মাটি ছেঁনে ছেঁনে,
নিউমোনিয়া হল বৌয়ের, অন্তঃসত্বা জেনে।
ঠিক মত আর হল নাকো তার তদবির করা,
মাস অনেক কাল ভুগে ভুগে সেও গেছে মারা।
রমেশ পোটোর সংসারেতে দ্বিতীয় লোক নাই,
রান্না-বাড়া ঠাকুর গড়া করতে হয় যে তাই।
চোখ আঁকতে মন বসে না; করুণা ঘন মুখে,

হাতের তুলি কাঁপছে হাতে ছেলে বৌ-এর দুঃখে।
বার বার তার ভুল হয়ে যায়; রমেশ পোটো কাঁদে,
জীবন ভরে গড়েছে সে কতই অরূপ ছাঁদে।

সমাপ্তি

ভালবেসেছিলাম সুন্দর পৃথিবীকে,—এখনও ভালবাসি
প্রতি ইন্দ্র দিয়ে করি উপভোগ পরিপূর্ণতার।
দিন, মাস, বছর থেকে এগিয়ে নিয়ে যায়
কালের সমুদ্রে,—আমার পরমায়ুকে।
আনন্দকে আঁকড়ে ধরি, যেন পরি সমাপ্তি না হয় তার।
জীবনের স্রোতে নিজেকে নিয়ে যেতে হয়!
হঠাৎ, গায়ে বিদ্ধ হয় ছোরা, পাইপ গানের গুলি
দেহ লুটিয়ে পড়ে প্রাণহীন হয়ে, সুন্দর ধরণীর বুকে—
আকাঙ্খার হয় সমাপ্তি।
পেছনে রেখে যেতে হয় অসংখ্য অসমাপ্ত কর্তব্য,
হাহাকার, দারিদ্র অথবা পরিবারের জীবন্ত সমাধি।
বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানবের দেহে দিতে পারে নাই প্রাণ,
সে প্রাণের মৃত্যু ঘটাবার কারোর নাহি অধিকার!
কোন নীতির, কোন রাজনীতির॥

গুল

আমাদের জীবনে
মিথ্যার কেনা-বেচা
অবিরাম বেড়ে চলেছে।
প্রতিদিন আমরা
জাল বুনে চলেছি
এ মহা মিথ্যার।
বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন
মহা মিথ্যার গুল থেকে,
রেহাই নাইকো কারোর।
ভদ্র পোষাক পরি
গাড়ি চড়ে পার্টি-মিটিং
তৈরি করি মিথ্যার—
সীমাহীন কালা-পাহাড়
ঠোক্কর খাই,
ভেঙে হই চুরমার।

কি পেলাম

তোমার ভালবাসা পাব বলে,
ভালবেসেছিলাম —
বর্ষায় ভেজা শ্যামল ধরণীকে।
কত ফুল, কত ফল।

তুমি নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন,
ভালবাসা কাকে বলে –
তুমি তা জান না—।
দম্ভে মত্ত,—
উগ্র থেকে আরও উগ্রতর।
পৃথিবী শুষ্ক, খরা পীড়িত।
আমার আকাঙখা, পছন্দ,
হাতে লাগা ময়লার মত;
সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেল।
ব্যক্তিত্ব যা ছিল,—
শীল নোড়ায় গুঁড়িয়ে
ধূলো করে ফেলে দিয়েছ।
এখন বড় ষ্টেশনে,—
পড়ে থাকা মাল গাড়ি
সর্বদাই সান্টিং খাচ্ছি,
যেখানেই রাখ,—আপত্তি নাই।

লাল কলম

দীপক কলমটা অত যত্ন করে রেখেছ কি ব্যাপার?
আবার মধ্যে মধ্যে আদর করছ?
লাল কলমটা এখনও আছে!
আমি আর 'ও' মন্দিরে গিয়েছিলাম।
ঠাকুরের সামনে দুজনে দুজনকে স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা—
কেউ কাউকে ছাড়ব না—

সিঁথিতে সিঁদুর দেবার মত ছিল না কিছু,
হঠাৎ দেখি আমার বুকেতে লালকালির কলমটা।
তার থেকেই আঙুলে মাখিয়ে,
ওর সিঁথিতে পরিয়ে দি ..।
সে কি অপূর্ব শিহরণ।
লাল কলমের কালির লিখন সিথিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।
অতীত দিনের স্মৃতি, আর এই বুকের কলম।

দাও

তোমার পাদপদ্মে সদাই মধু ঝরে,
সে পরম অমৃত আমি কখনও কি করি পান?
পূজা হোম আরাধনা তোমার সম্মুখে।
নিত্য আমি করি ধ্যান —।
কণ্ঠে সবার মিলায়ে কণ্ঠ মহাসঙ্গীত, করি যে গান।
প্রাণ সমুদ্র ঢেউয়ে চঞ্চল
বায়ু বহে সদা হয়ে উচ্ছল।
মুহূর্তের তরে পারি না সহিতে
আশা ভালবাসা কামনা বহিতে।
দেহ মন প্রাণ করি একাকার
তব পাদপদ্মের স্ফুটিত পাতায়।
কেন পারিনাকো করিবারে দান?
সকল দুয়ার বন্ধ করেছি
প্রাণেতে আমার পেয়েছি প্রাণ
দাও মোর প্রিয়, দাও প্রিয়তম
তব পাদপদ্মের মধু,—ওগো নিরুপম
জীবন আকাঙ্খিত পরম জ্ঞান।

ভুলিওনা

জীবনে ভালবাসা কত যে পেলাম
পরিপূর্ণ হৃদয়ে পরমানন্দে,—।
ব্যথা,—সে তো তোমারই দেওয়া,
হেসে হেসে কাছে আসে নৃত্যের ছন্দে।
অশান্তির মাঝে পরম শান্তি,
শান্ত সমাহিত ওগো জ্যোর্তিময়।
ক্ষতবিক্ষত রক্ত ঝরা অঙ্গ আমার
তোমার গাত্রে রক্ত ঝরিবে নিশ্চয়।
বিশ্বাস নয়, আছে নির্ভর,
যতই বিপদ আসুক হয়ে দুর্বার।
গোড়ের মালা হয়ে কন্ঠে আমার
একটা ফুল ঝরে গেলে ব্যথায় অপূর্ণতা।
অপূর্ণ রহিবে শান্তি রব দুঃখ পারাবারে
ভুলিয়ে রেখোনা মোরে সুখের আনন্দে
চতুর্দিক ঘিরে মোর রবে অহংকার
শান্তি মোর চিরতরে হবে বিসর্জন
পরমানন্দের প্রাপ্তি হবে না অর্জন।

অ-মিল

সারারাত দিন ধরে যে কল্পনা মাথায় দানা বেধেছিল-
তার কোন রূপ খুঁজে পাইনি।
কখন বা স্বপ্নে একটু ভেসে আসে।

মেলাতে চেষ্টা করলেও মিল পাওয়া যায় না।
চিন্তার কল্পনা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
আকাশে, পাহাড়ে, পর্বতে, জঙ্গলে, সমুদ্র সৈকতে—
কল্পনা পরিত্যাগ করেনি।
এ যেন রক্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।
চেয়ে দেখে কত মুখের দিকে, পারে না মেলাতে।
চলার ভঙ্গীতে নেই কোন মিল
তাহলে এ কি!
সুখ, আনন্দ, ব্যথায় দু-কূল ছাপিয়ে, কখনও বা চোখের
জল হয়ে গড়িয়ে পড়ে ওঁর নিঃসঙ্গ অবস্থায়।
উৎসাহহীন শূন্য দৃষ্টি.........।
উন্মুক্ত আকাশের নিচে কি খুঁজে বেড়ায় নিজের মনে
রূপহীন কল্পনা বুকে নিয়ে ছাড়ল শেষ নিঃশ্বাস।

অন্ধকার

সূচীভেদ্য অন্ধকার.........।
নিজেকে দেখতে পাওয়া যায় না।
সর্পিল রাস্তা অগম্য জঙ্গল,
এখুনি যেন কোন বন্যপশু থাবা মারবে।
অন্ধকারে নিঃসঙ্গ একা.........।
একটা সাপ পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে।
তার চোখ দুটো জ্বলছে, জ্বল জ্বল করে।
কোথাও গহ্বরে পা পড়ছে,
কখন বা বনলতার ফাঁস গলায় আটকে গেছে,

তবু চলা.........
নিজেকে দেখতে পাওয়া যায় না,
তাই আবরণেরও প্রয়োজন নেই।
অন্ধকারতো শেষ হবেই.........
আলোকজ্জ্বল প্রভাত আসলেই ঐ সাপটা চলে যাবে
গলায় লতার ফাঁসটাও খুলে যাবে।
না,—যেমন ছিল তেমনই থাকল
আলোকের পথ আর দেখতে পেল না।

প্রফুল্লদার জন্মদিনে

[পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী]

আকাশেতে পক্ষ মেলি বয়সের ডানা
উড়িয়া চলিছে মহাশক্তি নিয়ে শতাব্দীর পানে,
নিরলস ভয়শূন্য,—অগ্রগতি পথে নাহি মানে বাধা;
মহৎ প্রয়াসে— ।
গতি কভু স্তব্ধ নহে, অফুরন্ত প্রাণের আকর্ষণ।
ছুটে আসে লক্ষ লক্ষ নরনারী,
তোমার ক্লান্তিহীন যাত্রাপথে হতে সাথী।
দেখি নাহি রোষ চক্ষু, রুক্ষ বৈশাখের।
শান্ত সমাহিত অন্তর, প্রেমের বসন্ত বাতাস
সর্ব দুঃখ মুছে দেয় প্রেমের পরশে,
কর আলিঙ্গণ বিশ্বজনে—।
এই শুভক্ষণে গণদেবতার আশীর্বাদ নিয়ে
হও মৃত্যুঞ্জয়ী—

কোথা আশ্রয়

পৃথিবী এত বড়......

তার থেকেও আরও বড় সীমাহীন আকাশ

নিজেকে এতটুকু ঠাঁই করে নিতে পারল না,--

এই পৃথিবীর কোন কোলে?

আশ্রয় নিতে গেলে আকাশটা সরে সরে যায়।

পৃথিবীর মাটি পায়ের তলায়, না।

প্লাবনে বা মানুষের সৃষ্টি করা ভাঙ্গনে,

কখনও বা আগ্নেয়গিরি ভূকম্পন।

প্লাবন আর অগ্ন্যুৎপাত ভাসিয়ে নিয়ে যায়

হল না, --স্থান হল না;

সৃষ্টি হল লক্ষ লক্ষ মৃতদেহ, –

ভেসে গেল অজানার পথে।

ঐ গলিত দেহ একদিন মৃত্তিকা তৈরী করবে।

তবু যারা আগন্তুক,- সে পৃথিবীতে তাদের হবে না স্থান

তাহলে –

একটু আশ্রয়, একটু খাদ্য এরই জন্য এই সংগ্রাম,

অনাদিকাল ধরে চলবে,--শেষ নেই।

জমাদার

আমাদের জমাদার পার্কের রেলিং-এ
চাটাই দিয়ে ঘর করে রয়েছে স্বামী-স্ত্রীতে।
বয়স পেরিয়ে গেছে পঞ্চাশ, রাত্রদিন থাকে ফুটপাতে
বৃষ্টিতে যায় ঘরে আবরুর নেই বালাই।
আত্মীয়-স্বজন, অতিথি অভ্যাগত—
মৃত্যু, বিবাহ, বিচ্ছেদ ও প্রসব একই সঙ্গে বাধা থাকে,
—ঐ ফুটপাতে!
ওঁরা কি খায়?
সুস্থ মাথায় থাকলে কখনও কি পারে,—
নর্দমা পায়খানা করিতে পরিষ্কার।
মরা, পচা জীবজন্তু হাতে করে ফেলে দিয়ে
—পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখে......।
পৃথিবী অসুস্থ হবে।
জাতিধর্ম নির্বিশেষে, করে সমাজের সেবা।
তাই নিজেকে ভুলে থাকে নিজের জাতিত্বের অভিমান।
ওদের প্রাণটা যেন...... ।
সদ্য উনুনে কয়লা দেওয়া ধোঁয়ায় ভরা রান্না ঘর
ঝুল-কালি ভরা জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য—হচ্ছে রান্না।
ফুটছে কাঁকর মেশা চাল,—
চোখ দিয়ে অঝরে বেরিয়ে আসে জল, —কান্না।
গুদাম থেকে ফেলে দেওয়া ডাল খুঁদ কত
সব একাকার হয়ে টগ্‌বগ করে ফুটছে
তারি সাথে খপ্‌ করে ফেলে দিল একগুচ্ছ

নানা পশুর নাড়ি-ভুঁড়ি, নুন, লঙ্কা আর হলুদ
অতি উপাদেয় খাদ্য,--নাই কোন ঘেন্না নেশায় বিভোর।
মারপিট রক্তারক্তি বৌকে বেচে দিয়ে দেয়।

ডরথি

[১৯৪৮ সালের প্রেক্ষাপটে,
চরিত্র কাল্পনিক]

কার্পেট বেছান স্নানাগার,—অনভ্যস্ত স্নান,
জল ছিটিয়ে পড়ে কার্পেটের পরে।
গৃহপরিচারিকা পরিষ্কার করিতে আসিয়া
মুখপানে চাহি নিষ্ক্রান্ত হইলেন কক্ষ হইতে।
ম্যানেজার আসিয়া উপস্থিত।
সুইডেনের লোক তিনি।
ইংরাজী জানেন না ভাল, কি ভাষা বলিলেন;
বুঝিল তিরস্কার সম।
খবর চলিয়া গেল মালিকের কাছে,
আসিয়া উপস্থিত হইলেন ভদ্রমহিলা।
অতি পরিপাটী বেশ, সোনালীবর্ণ কেশ দাম, নীলাভ চোখ।
পরিস্কার ইংরাজীতে কহিলেন,--
পরিচয় পত্রে দেখিতেছি, ভারতের কোন অভিজাত পরিবারে।
তুমি কি কভু করিতে জাননা স্নান?
ঠাণ্ডা ও গরম জলের ব্যবস্থা করা অতি সুন্দর দীর্ঘ বাথটাব।
আর কার্পেট—
পাঁচ পাউণ্ড জরিমানা হইবে তোমার।
ওঁর মস্তিষ্ক ঘুরিয়া যায়,—উত্তর নাহি যে তব।

সবিনয়ে কহিল,—হয়ে গেছে ভুল "ক্ষমা কর মোরে"।
স্মিতহাস্যে কহিলেন,—এ ভুল কর নাকো আর।
ধন্যবাদ...... !
প্রাতরাশে এস ; ওঃ ! তুমিতো নিরামিষাশী।
দুধ যদি পছন্দ কর, এক পেয়ালা দিতে পারি'
অতীব কষ্টে
প্রাতরাশ সেরে ভদ্রমহিলাকে অতি নম্রভাবে বলে,—
তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করে—"স্নেহময়ী দিদি"।
আমাদের ভাষায় শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধেয়া
বুঝিয়া হইলেন প্রীত... .
জিজ্ঞাসিলেন,—কখন আসিবে তুমি মধ্যাহ্ন ভোজনে?
আলাদা করিয়া খাদ্য রাখিব,—কোন চিন্তা নাই।
ম্যানেজারের কাছে করিবে না প্রশ্ন, কোন ঠিকানার।
প্রশ্নের উত্তর দিতে,—দশ সিলিং করে বেড়ে যাবে বিল।
কাল রবিবার ; ছুটি আছে।
প্রাতরাশ সমাপনে গন্তব্যস্থান দেখাইব তোমা।
সেইমত দুইজনে বাহির হইল, বাস, টিউব রেলে ঘুরে,
সারাদিন দশবারোটা সংস্থার হইল সন্ধান।
সন্ধ্যায় গৃহে এসে ক্লান্ত দেহখানি
পরিচারিকার আগমন খাদ্য লইয়া।
ঘুম আসে না,—প্রায় দশটা বাজে।
দরজায় ছোট্ট টোকা......
এক কাপ দুধ নিয়ে কক্ষেতে প্রবেশ—
সারাদিন পরিশ্রম,—'খাও এইটুকু'।
বসার অনুরোধ করে পেয়ালাটা লইল হাতে,—
শুধু একটি কথা বলে,—অতি সুন্দর।
কে ? আমি না দুধের পেয়ালা ?

পালকের লেপখানি গায়ে তুলে দিয়ে

খালি পেয়ালাটা লয়ে চলে যান তিনি।

ঘুমাও, শুভরাত্রি......।

ধন্যবাদ।

মাথায় উদ্‌ভট, চিন্তা আসে......

অবিচার অত্যাচার, লুন্ঠনের নামে যারা করেছিল শাসন।

বন্দুকের নল আর কামানের গোলায়।

ফাঁসির মঞ্চে বলি হল শত সহস্র জীবন।

লক্ষ লক্ষ নরনারীর রক্তে প্লাবিত হয়েছিল যে ভারত।

কষ্টার্জিত স্বাধীনতা এতদিনে হল যাহা লাভ

অখণ্ড ভারতকে খণ্ডিত করিয়া।

কোটি কোটি গৃহবাসী হয় গৃহহারা,

আশ্রয় লইল, কান্তার মরু, কোথাও বা বৃক্ষতলে।

অতি বর্বর, বাণিজ্যের নামে শোষণ করিয়া গেল দেশের সম্পদ।

ইচ্ছা হয় দেখিতে ওদের দেশ, আর

বাণিজ্যের আঙ্গিক গঠন,—তাই আসিয়াছে।

ভ্রমণ সংস্থা করে দিল সর্ব আয়োজন হাওয়াই যাত্রাপথে।

লণ্ডন শহরে অক্সফোর্ড সার্কাস, অভিজাত হোটেলে থাকার ব্যবস্থা।

যুদ্ধের পরে সর্বত্র খাদ্যের অভাব।

বাহিরের দেশ থেকে আসিলে খাবার,—তবে পাওয়া যায় খেতে।

দরিদ্র ভারত 'যন্ত্র শিল্পে......।

ওদেশ থেকে আনিবার একান্ত প্রয়োজনে—যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম।

সপ্তাহ তিনেক যায় কর্মসূচী করিতে গঠন।

নিরামিষ প্রাতরাশ—-আলুসেদ্ধ, টমেটো, একফালি রুটি ও ডিম।

অতি কষ্টে হইত সংগ্রহ।

দুগ্ধ সে তো শিশুখাদ্য হোথা!

সকালে স্নান, প্রাতরাশ

সব অতিথি ছেড়ে একটিই প্রশ্ন শুধু,—
কেমন হয়েছিল ঘুম রাত্রিতে!
কোন উত্তর না দিয়ে যায় খাওয়ার টেবিলে,—
ব্যবস্থা আরও উন্নততর।
খেতে না পারায় কিছু খাদ্য থেকে যায় অবশিষ্ট।
শোন--বৃটেনের রাজার নাহি অধিকার খাদ্য নষ্ট করিবার!
'নাও' খেয়ে, কি ভর্ৎসনা।
স্নেহময় শুধু দুটি কথা ;—
ঘড়িটা হাতে আছে তো ? একটার বেশী বিলম্ব না হয়।
কিন্তু,—হল গোলমাল......
ইণ্ডিয়া হাউসে যেয়ে কত বন্ধু মেলে,—আবৃত্তি গান আর
উচ্ছল আনন্দ।
ওখানে কাছে এক রেস্তোরাঁয় খাওয়া দাওয়া।
পাঁচটা বাজিয়া যায় তবু আড্ডা ছাড়িবারে মন নাহি চায়।
ইণ্ডিয়া হাউস থেকে হোটেলে ফেরে সন্ধ্যা ছ'টায়।
অতি ধীরে নতমস্তকে চাহিল কক্ষের চাবি।
উত্তেজিত হয়ে বললেন তিনি,—কোথা তুমি ছিলে সারাদিন?
কিছু কি হয়েছে খাওয়া ? এস এই দিকে।
ঐ দেখ, তোমার আর আমার খাবার রয়েছে ঢাকা।
নাহি কোন উত্তর।
মনে হল এ যেন তার পেলব পলিমাটি গড়া
স্নিগ্ধ বাংলার অতি স্নেহময়ী দিদি।
মুখপানে চাহি শুধু একটিই প্রশ্ন--
খাও নাই কিছু......?
এস, বস চুপ করে খেয়ে নাও।
কোথা ছিলে সারাদিন....?

অস্ফুট স্বরে করে উত্তর—"ইণ্ডিয়া হাউসে"।
অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিল সেখানে,—বুঝতে পারিনি।
সন্ধ্যায় পরিচারিকা আসিয়া খাবার দিয়ে যায়।
আবার, দশটায় এক পেয়ালা দুধ হাতে আসিলেন......।
অনুরোধ করে বসিতে ওর বিছানার পরে।
কি বলিতে চাও ?
একটাই প্রশ্ন শুধু জাগে মনে।
নির্ভয়ে বলিব কি তাহা ?
আচ্ছা, তুমি আমাকে এত ভালবাস কেন ?
আরও তো অতিথি আছে তোমার।
কিছুকাল চুপ করি দিলেন উত্তর
হাজার হাজার মাইল এসেছ একেলা
এটা নহে তব নিজ দেশ, তব গৃহ।
কার্য্য অন্বেষণে আগমন হেথা।
যদি আমি তোমায় নাহি ভালবাসি।
বাড়ীর জন্য কাঁদিয়া উঠিবে মন,—হইবে অস্থির।
কর্ম অসমাপ্ত রবে।
দেশে ফিরে যেয়ে আমার গল্প তুমি করিলে সকলের কাছে,—
খুশি হব আমি—
একটা বৃটিশ মেয়ে ভালবেসেছিল মোরে,
—কর্মের প্রেরণা দিতে।
সেই সুনামটুকু আসিবে ফিরিয়া
আমার দেশের কাছে,– বৃটিশ জাতির মুখ হইবে উজ্জ্বল।
শুধু এইটুকু গর্ব আর কিছু নয়—।
পরদিন কিছু কার্য্য করি সমাপন
আনন্দের টানে গেল ইণ্ডিয়া হাউসে।
পূর্ব্ববঙ্গের সন্তান, উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় এসেছিল হেথা।

ফেল করে এখন রেস্তরাঁর কর্মচারী।
দেশে ফেরার স্থান নাই আর।
দেশতো হয়ে গেছে ভাগ—উদ্বাস্তু সে!
ছুটে এসে বলে, 'হ'! জয়ন্ত, আচ্ছস কেমন?
কালকে যে এত হল্লাগল্লা করল্যা,—
হোটেলে যাইয়া কি কিছু ছিল মনে!
পয়সা নাই, সিগারেট খাইতে পাইনা।
দে'ত একটা সিলিং......
অত হাসি মুখ ক্যান?
দেখ, আমাকে একটার ভেতর যেতে হবে ফিরে।
আজ আর বেশীক্ষণ আড্ডা নয়।
আমি না ফিরিলে দিদির হবে না মধ্যাহ্ন ভোজন।
অবাক হইয়া মুখপানে চাহি, -কি কইচ্ছস্।
দিদি! এখানেও সম্পর্ক পাতাইলি?
প্রেমের গন্ধ আছে নাকি?
না, ওসব কিছু না—।
একটা সিগারেট খাবে না, একবারে......।
বিদেশে পয়সার দাম অনেক
কাল যদি আসি, আর এক সিলিং পারিব না দিতে।
বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হয় হয়।
সকল অতিথির ভোজন সমাপন।
ধীর পদক্ষেপে প্রবেশিল খাবারের ঘরে।
আজও তুমি করেছ বিলম্ব।
কাজ কিছু হল...? দেখি নোট বই!
বস......।
আহারান্তে আবার বেরিয়ে পড়ে কাজের নেশায়।
পরিচয় হয় এক বয়স্কা ভদ্র মহিলার সাথে।

অতি স্নেহপ্রবণ, প্রখ্যাত ধনী ব্যবসায়ীর স্ত্রী।
ওর ব্যবসায়েব বক্তব্য করিয়া শ্রবণ।
একটা ঠিকানা দিয়ে বললেন–
দূর প্রায় আশি মাইলেব মত
রেল স্টেশনের দিয়ে বিবরণ,
মহিলাও থাকিবেন স্টেশনে উপস্থিত।
সেইমত প্রায় চারদিনেব সফরে হইল যাইতে
ওদের বিরাট যন্ত্রপাতি প্রস্তুতির কারখানা।
স্টেশনে ছিল গাড়ী ।
এত আতিথেয়তা, কল্পনায় আসেনি কোনদিন।
সব যেন চিন্তার অতীত।
ভদ্রমহাশয় জয়ন্তর ব্যবহারে সন্তুষ্ট।
আসিবার দিন হাতে তুলিয়া দিলেন একগুচ্ছ কাগজ
পড়িয়া অবাক জয়ন্ত,—বপ্তানী করিবাব প্রাবম্ভিক তালিকা
আনন্দে আলিঙ্গন করিল বয়স্ক দম্পতিকে।
হাত জোড় কবি, করে নমস্কার
এবাব বিদাযেব পালা ;
স্টেশন পর্যন্ত এসে মহিলার স্নেহমাখা চোখ দুটি করে ছলছল্।
জানে না সে এই কদিনে কত ভালবেসেছিল তারে।
মানুষ ভুলিয়া যায় বহু অতীতকে
কিন্তু সে অতীতই ছিল এক বতমান।
পাঁচদিন বাদে হোটেলে প্রত্যাবত্ন, –সন্ধ্যাব দিকে।
ছিল ভয় মনে খাবার পাইবে কিনা।
শুভসন্ধ্যা বলে—
ঘরের চাবিটি চেয়ে নেয় পরিচারিকা থেকে।
আগমনের খবর পাইয়া,—ঘরে আসিলেন দিদি।
কেমন, কি হল কাজ জানিবার তরে।

বিছানাটি পরিপাটী, আরও টুকিটাকি কাজ......
শ্রান্ত বোধ করি, দিলেন আদেশ এক পেয়ালা দুধের
তোমার সৌভাগ্য কামনা করি।
আমি নীচে যাই......
বেশী রাত করিবে না খেতে আসিবারে।
ঘুমিয়ে পড়েছিল জয়ন্ত ক্লান্ত দেহ নিয়ে
টেলিফোন বাজিল বালিশের পাশে
জানিল রাতের আহারের সময় হয়েছে উত্তীর্ণ।
সব অতিথিদের খাওয়া সমাপন।
চলে এস তুমি বিলম্ব কর না।
স্বচালিত লিফটির বোতাম টিপিয়া একেবারে খাবার গৃহে'
অপূর্ব, সাজান টেবিল, মধ্যখানে ফুলদানী
নানাবিধ খাবার সাজান।
জান, নিজহাতে তৈরী করিয়াছি কেক্
তোমাদের দেশে হয় কি?
স্মিত হেসে দেয় উত্তর -
বহু রকমের বোঝান অতীব শক্ত।
প্রথমে খেয়ে দেখ কেমন হইল?
ওঃ হোঃ, কাঁটা চামচ এখনও শেখনি ধরিতে।
এই দেখ, এমনি করে ধর আর এমনি করে কাট।
নাও মুখে দাও, কেমন? মুখপানে চান
এক কথায় অতীব সুন্দর।
আমার যতখানি ক্ষমতা প্রস্তুত করিয়াছি।
তোমার কত ভাল লাগিবে তাহা নাহি জানি।
তোয়ালেতে হাত মুছে উঠিয়া পড়ে
কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া আসে,
বলে দুধের পেয়ালা দাও,—না হলে কষ্ট হইবে তোমার।

তুমি যাও......।

ঠিক দশটা বাজে, দরজায় টোকা।

দুধের পেয়ালা নিয়ে এসেছেন দিদি।

আজ আর দূরে নয় বিছানায় বসে,

পেয়ালাটি ধরে দেয় জয়ন্তর মুখে

তোমার এই সোণালী কেশ, চোখ দুটো সাগরের নীলা।

আগেও বলেছি কত সুন্দর।

সত্যি আমি!

উজ্জ্বল হাসি দিয়ে মুখটাকে বুকেতে চাপিয়া ধরে।

আর তুমি, তুমি কি সুন্দর নও?

কিছুদিন বাদে,—

ইণ্ডিয়া হাউসে বন্ধুদের সাথে হইল সাক্ষাৎ।

কোথা ছিলা জয়ন্ত এতদিন?

ভুলছ আমাগো কি হইতাছে তোমার?

অত হাসি মুখ ক্যান?

দিদির যত্নের কথা বলিলে,—

জয়ন্তকে জড়িয়ে ধরে কি যে আনন্দ।

বৃটেনের বহু কারখানা, অনেক শহর ঘুরিয়া

ভাগ্যলক্ষ্মীকে জয়ন্ত খুঁজিয়া বেড়ায় কাজের নেশায়।

ছয় মাস কাটিয়া যায়—।

ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না—।

হোটেলে পাবে কিনা স্থান,

চিন্তা করিয়া একেবারে চলিয়া আসে।

সুইডিশ ম্যানেজার দেখিয়া বলে,—

দুঃখিত, স্থান নেই।

তবু মনে হল, একবার মালিকের সাথে দেখা করি।

লয়ে অনুমতি, ডরথির কাছে যায়।

শুভাশুভ জিজ্ঞাসা করিয়া,
প্রসঙ্গ উল্লেখ করে, ম্যানেজার বলিয়াছে স্থান নেই হেথা।
উষ্ণস্বরে রাগান্বিত হয়ে হুকুম হইল ম্যানেজার,
আমাকে না করে জিজ্ঞাসা জয়ন্তকে দিয়াছ ফিরায়ে।
ঘর নেই? বলিয়া চাবিটি ফেলে দেন।
যাও আমার অতিথিগৃহে কর আয়োজন।
পূর্বে যাহা ছিল, তার থেকেও অতীব বিরাট বিলাসবহুল।
মনে শঙ্কা হয়, এত টাকা পারিবে কি দিতে?
রাতে যথারীতি আহার, তারপর শয্যাগ্রহণ।
সন্ধ্যা দশটায় পরিচারিকা এক পেয়ালা দুধ নিয়ে
প্রবেশ করে কক্ষেতে, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জয়ন্ত চাহে তার পানে।
উত্তর বলে—অসুস্থ ডরথি।
অনুরোধ করি তাকে, চব্বিশ ঘন্টার বিল পাঠাইতে।
পরিচারিকা কহিল আসি, পেলাম না কোন বিল।
এদিকের কাজ আরও 'দু-চারদিন' করে,
শুধু মনে হয় অসুস্থ ডরথিকে দেখা উচিত কিনা।
কি মনে করবেন তিনি?
পরদিন সকালে প্রাতরাশ সারি।
পরিচারিকাকে অতি ভীত ভাবে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করে।
একটু অনুমতি দিতে পার, তোমাদের মালিককে দেখবার?
ইশারায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া টেলিফোনে অনুমতি চায়।
হাসিমুখে জয়ন্তকে নিয়ে যায় সাথে।
অতি সন্তর্পণে দাঁড়িয়ে আছে জয়ন্ত
স্মিতহাস্যে পরিচারিকা দেয় অনুমতি।
স্বচ্ছ গাত্রাবাস, অস্ফুটিত পদ্মদুটি রহিয়াছে ঢাকা।
সর্বাঙ্গে লাবণ্যের রেখা, অনিন্দ্য অনুপম...
যেন কোন ফরাসী চিত্রকর তৈল রং-এ রেখেছে আঁকিয়া—

একটি চিত্রপট।

এত সুন্দর আসবাব পত্রে সজ্জিত শয়নগৃহ,

বিস্মিত জয়ন্ত রহিল দাঁড়াইয়া।

কি, আমি অসুস্থ!

চারদিন আসিয়াছ হেথা, লও নাই খোঁজ।

নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তি জয়ন্ত দাঁড়িয়ে।

কথা নেই কেন?

অন্যায় হইয়া গেছে।

এস বস কাছে।

তুমি জান না, ভালবাসা কত মহান স্পর্শকাতর।

তবু নিরুত্তর......

বস এইখানে......।

বাইরের জামাকাপড় যদি কিছু ক্ষতি হয় আপনার।

তাই দাঁড়িয়ে আছি।

কপালে হাত দিয়ে দেখ কতটা জ্বর?

জ্বর দেখিবার পূর্বেই হাতদুটি ঠাণ্ডা বরফ।

ঐ শীতে কপালে আসিয়া যায় বিন্দু বিন্দু ঘাম।

হাত খানি ধরে কাছে টেনে কপাল স্পর্শ হতে,

সঙ্কিত হয়ে বল্লে—জ্বর অনেক।

আচ্ছা, বলতো সত্যি আমি সুস্থ হইব কি আবার।

অতীতের এক মর্মান্তিক মৃত্যু বিভীষিকা ভেসে ওঠে চোখে।

এ কি কথা বলিতেছ;

কেন? ঠিকই তো বলছি।

যদি পাই অনুমতি, তাহলে ফিরিবার পথে।

তোমার জন্যে আনিব আঙ্গুর।

হাতখানি কাছে নিয়ে একটু চুম্বন।

আসবে তো?

স্নেহাতুর চোখ দুটি জয়ন্তর মুখ পানে।
অপলক দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে রয়।
ব্যাঙ্কের কাজকর্ম যাহা কিছু ছিল ত্বরায় করিয়া সমাপন।
কোথায় যাইবে জয়ন্ত বুঝিতে না পেরে,
তপ্ত হস্তপরশ ঘুরিছে মস্তকে।
পিকাডেলী ভারতীয় রেস্তরাঁয় করি মধ্যাহ্ন ভোজন,
চলিয়া যায় হাইড পার্ক সারপেণ্টাইন।
অনেক মঞ্চ আছে এদিক ওদিক
উচ্চকণ্ঠে সবে বক্তৃতার অভ্যাস
কোথাও বা প্রজাপতি জোড়ায় জোড়ায়
লাল নীল কত রঙের ঘুরিয়া বেড়ায়।
কিন্তু, জয়ন্ত একা,—নিতান্তই একা।
এই বৃটিশ জাতি কি অত্যাচার করেছে আমাদের পরে।
দেশটাকে ভেঙ্গে দিয়ে করেছে গৃহছাড়া
ভবিষ্যতে কোথায় আলো—!
শুধু অন্ধকার......।
দারিদ্র ঘিরিয়া আছে শিক্ষার অভাবে।
জালিয়ান ওয়ালাবাগ আর ফাঁসীর মঞ্চ সম্মুখে ভাসিয়া উঠে
এরা কি বাসিতে পারে ভাল,—এই সংশয়।
গৃহ নাই, মাথা গুঁজিবায়
অথচ যে রাজকীয় ভাবে রয়েছে এখানে।
না ভালবাসা নয়, স্নেহ নয়।
এরা জানে অত্যাচার, অবিচার আর হত্যার তাণ্ডব
নহে প্রেম শুধু রাখিতে চায় পদানত করি।
বিদেশ বিভুঁই কোথায় কি হবে,
নাহি জানা আছে ; কিন্তু ভগ্নি স্নেহ।
সর্ব জাতি সর্ব দেশে ফল্গু সম থাকে বহমান

চিন্তা করিতে পারে না জয়ন্ত

থাক না,—

একটু আঙ্গুর বইত নয়।

সবার তো জানা আছে বৃটেনের আঙ্গুর অতি সুমধুর।

শুধু কি আঙ্গুর,—প্যারিসের সুন্দর সেণ্ট লইল আঙ্গুরের সাথে

নিজকক্ষে প্রবেশ না করিয়া সোজা যায় চলি।

ডরথির পরিচারিকার লয়ে অনুমতি।

জ্বর কিছু কম।

বেশবাস সুবিন্যস্ত আরও সুন্দর।

সোনালী কেশ দাম সমুদ্রের নীলাভ আঁখি,

ঠোঁট দুটি এত সুন্দর,—যেন ডালিম ফুলের রং।

সৌন্দর্যের এত রূপ বর্ণনা করিতে পারে না।

আঙ্গুরের গোছা আর আতরের শিশি

কোথায় রাখিবে নাহি পায় দিশা।

নিজে একটি পাত্রে আঙ্গুরগুলি নিয়ে

ছাড়াইয়া ধরে ওর মুখের কাছে।

বলে,—কর গ্রহণ।

না,—তুমি দাও!

অতি স্বযত্নে একটি একটি করে দেয়

ওর রক্তিম ঠোঁটের মাঝে।

গন্ধটা দেখতো কি সুন্দর।

এ কি!

জয়ন্তের সর্বাঙ্গে দিল ছিটায়ে

বহুক্ষণ কথা কিছু নাই।

জয়ন্ত হারিয়ে ফেলে, নিজেকে,—কি বলিবে আর!

হাতখানি চুম্বন করে—তুমি ভাল হও দিদি।

উঠি উঠি করিয়াও আর পারে না উঠিতে।

আচ্ছা, তুমি এত সুন্দর ইংরাজী বল,
তোমাদের মাতৃভাষা বোধহয় ইংরাজী?
আচার ব্যবহার আমাদেরই মত,
স্মিত হাস্যে কহিল জয়ন্ত আমার এই ধুতি আর
গলাবন্ধ জামা দেখলে কি মনে হয় তোমাদের পোষাক?
রোজ সকালে কি গান কর তুমি?
তোমরা যেমন পড় বাইবেল,—
তেমনি আমাদের ঐ ধর্মীয় বই।
নাক, চোখ, হাত, পা সবই এক,—একটাই শুধু—
তোমাদের চম্পক বরণ রং আর আমাদের!
সে তুমি ভালই জান।
ভয় হয়,—অনেক তফাৎ।
আমি আসিয়াছি হেথা ভাগ্য অন্বেষণে।
আর তুমি হেথা সুপ্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীর আসনে।
তোমাদের এই প্রাসাদ রোলস, লণ্ডন উপকণ্ঠে বৃহৎ খামার।
তুমি ও তোমার পিতা অতি ধনবান।
আমাকে দিয়েছ তুমি প্রাণ ভরা অন্তরের স্নেহ।
আসি আজ।
একটু ফিরিয়া বলে,—হোটেলের বিলটা দিলে
বোঝা যাবে পকেট মোর সক্ষম কিনা?
জয়ন্ত, আর তুমি বল নাকো কিছু।
অনেক আঘাত তুমি দিয়াছ আমায়।
যাও চলে, মুহূর্তে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।
জয়ন্ত নীরব।
ভরথী আবার বলে,—তুমি যাও, যা-ও, যা-ও......
জয়ন্ত নিশ্চল।
কাছে গিয়ে ওর চোখদুটি অত্যন্ত আদরের সহিত মুছাইয়া দেয়,

আসিব কাল প্রত্যুষে।
আবার কাজ, সকালে আসা হল না।
সন্ধ্যায় ফেরার পথে অনুসন্ধিৎসু মনে আঙ্গুরের গোছা নিয়ে।
ডরথীর কক্ষ সামনে টুং-টাং বেল দিলে,
আসিবার অনুমতি বলে ঢুকে কক্ষে।
দেখে পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে,
ভাবিতেছে মস্তকে তাহার হস্ত রাখিবে কিনা।
তবু ভয়ে ভয়ে অঙ্গুলি সঞ্চালন করে,
ঐ সোনালী কেশ দামে।
ফের তুমি আসিয়াছ, দুঃখ দিতে মোরে।
হঠাৎ উঠিয়া বসি রুক্ষস্বরে কহিল যে কথা,
তুমি হয়েছ গৃহহারা, ভাগ্য অন্বেষণে আসিয়াছ হেথা।
এই যুদ্ধে আমার দু-দুটি ভাই সৈনিক হইয়া
আর ফিরে আসে নাই গৃহে।
স্বাধীনতায় হল বলি, পেলাম কি তাদের?
অর্থ সম্মান নাইট উপাধিকারী পিতা আমার,
কি আছে জীবনে...।
বিবাহ,—করি নাকো আশা।
বৃটিশ যুবক সব হয়েছে নিহত যুদ্ধের ফাঁদে,
যাঁহাদের মনে ছিল ভালবাসার ছোঁয়া।
আজ আছে হেথা—সুইডিশ, নরওয়ে, ডেনমার্কের
রূঢ় ব্যবহারীরা, রুচিহীন সব।
ভাগ্য তুমি খুঁজিয়া ফিরিছ?
আমার এত ঐশ্বর্য, তুমি শান্তি পাবে না কি?
এ কি তোমার কাছে তুচ্ছ!
জয়ন্তের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে,
নিজেকে খুঁজিয়া ফেরে ডরথীর মাঝে।

আচ্ছা আসি, আবার সময় করে আসিব নিশ্চয়।

ব্যবসা চলিতেছে,—

রপ্তানি হয় দ্রব্য ভারতবর্ষে, ব্যাঙ্কের মাধ্যমে।

আরও একমাস বাদে জয়ন্তর কাছে।

বিলাসবহুল ঘরের বিলটি আসিল।

পূর্বের তুলনায় অতীব নগন্য।

অনুমতি নিয়ে ডরথীর কাছে হয় আগমন।

বিলটি দেখাইয়া বলে,—এত স্নেহ, এত দয়া বহিবার আছে কি ক্ষমতা?

আরও দু-মাস থাকিবার খরচ রহিয়াছে কাছে।

টাকা যাহা আছে রাখ কাছে, দরকার মত লইব চাহিয়া।

শরীর কেমন?

আজ তো বেশ লাগিতেছে ভাল।

রবিবার লণ্ডনের বাইরে যাব, যাবে?

পিতা আনন্দ পাবেন, তোমাকে দেখিয়া।

ঘণ্টা দু-এর রাস্তা...।

জয়ন্ত সম্মত হয়

প্রাতরাশ সারি রবিবার সকাল ন'টায় রওনা হল 'রোলস্'।

জয়ন্ত আর ডরথী পেছনে সীটে বসে।

কিছুদূর যাবার পর জয়ন্ত কহিল,—

ড্রাইভারকে বল না,—আমি একটু চালাই।

সোফারকে গাড়ী থামাইতে বলিয়া জয়ন্ত ধরিল স্টীয়ারিং।

ডরথী আসিয়া বসিল পাশে।

কি জানি কোন হয় কি বিপদ?

সুন্দর তোমার হাত।

জয়ন্তর স্কন্ধে হাত রাখি কত হাসি, কত গান।

দেখ, হইবে কোন বিপদ, তুমি এত চঞ্চল হইলে।

খামারের গেটের সম্মুখে লেখা এ. কে. নরিশ।

এত বড় লোক!

জয়ন্তর জিহ্বা শুকাইয়া যায়, বক্ষ করে দুরু দুরু।

বয়স আশির উর্দ্ধে, অতি সৌম্যদর্শন পিতা ভরথীর।

জয়ন্তর স্কন্ধে হাত রাখিয়া স্মিতহাস্যে কহিলেন তিনি।

শুনেছি তোমার গল্প কন্যার কাছে।

আমি খুবই প্রীত, আনন্দিত।

যাও বিশ্রাম কর, মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হইবে আলাপন।

যথারীতি মধ্যাহ্ন ভোজনের টেবিলে ওরা তিনজন।

বেয়ারা খাবার দেয়।

কাঁটা চামচের ব্যবহার জয়ন্ত শিখিয়াছে।

ওর নম্র ব্যবহারে নরিশ সাহেব হয়েছেন প্রীত।

খেতে খেতে কত গল্প কত হাসি।

জয়ন্ত শুধু বলে আপনারা এত ভাল, এত অমায়িক।

কিন্তু ভারতকে শাসন করেছিল যাঁরা,—

এত নির্মম নিষ্ঠুর, এত অত্যাচারী কি করে হয়েছিল?

মুখেতে আঙুল দিয়ে ইশারায় বলিলেন চুপ কর।

তুমি ছেলে মানুষ, রাজনীতি আর ভালবাসা এক নয় কভু।

লক্ষ লক্ষ নরনারী হত্যা করে, রাজনীতির কঠোর খেলায়।

দেশকে ভাঙ্গিয়া করে খণ্ড-বিখণ্ড।

বাস্তুহারা হতে হয়, অগণিত নর নারীকে।

আর্ত্তের সেবায় নেমে আসে সে এক নারী,—

নাম তার ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল।

আমি কি করেছি কিছু ভুল,—তোমাকে বোঝাতে?

বাধা দিয়া ভরথী কহিল পিতাকে......

একটা ভাই-তো তুমি দিতে পার মোরে?

কি বা প্রয়োজন তব অর্থের।

—যদি পাই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন।
আবেগে উচ্ছলে,—জয়ন্তর মুখখানি বারবার আদরে করিয়া চুম্বন,
বলে—থাক তুমি হেথা ভগিনীর কাছে॥

চেয়েছিলাম

নীল আকাশের তারা হয়ে ঝলমল করে ফুটতে আমি চেয়েছিলাম
সমুদ্রের ঐ বুকের পরে সেই ছায়াটি, ঢেউ-এর দোলায় দুলতে
আমি চেয়েছিলাম।
সন্ধ্যাবেলা জুঁই-এর গাছে গন্ধভরা ফুলটি হয়ে ফুটতে আমি চেয়েছিলাম।
পৌর্ণমাসী জ্যোৎস্না আমি ধবলগিরি মাথার পরে
শ্বেত বরফের রূপালী আলো হয়ে জ্বলতে আমি চেয়েছিলাম।
হিমালয়ের মাথা থেকে গঙ্গার উন্মাদ স্রোতের বুকে,—
সবার মাঝে আমায় আমি বিলিয়ে দিয়ে, হাসি মুখে ভেসে যেতে
চেয়েছিলাম।
কোথায় গেলাম স্রোতের টানে দিক হারিয়ে।
সমুদ্রের ঐ অতলগর্ভে অন্ধকারে ডুবে গেলাম, তলিয়ে গেলাম।

ফুটপাতের বাচ্চা

ফুট ফুটে ওই বাচ্চাটি
ফুটপাতে ওর জন্ম।
মাথার 'পরে নীল আকাশ

রাতের বেলায় চটের ছাওয়া
ওটাই ওদের ঘর,
এপাশ ওপাশ করে
মাটি খুব শক্ত করে ধরে
পড়তে পড়তে আবার উঠে দাঁড়ায়
এমনি করে হাঁটা শেখা হয়।
ফুট ফুটে ঐ বাচ্চাটি
শক্ত পায়ে চলতে শিখেছে
ঋজুদেহ নাইকো জ্বরা-ব্যাধি
শাকপাতা যেদিন যেমন হয়
আনন্দ ও উল্লাস
ফুট ফুটে ওই বাচ্চাটি
খেলছে রাস্তায় ড্যাং-গুলি
সদাই থাকে ডাণ্ডা হাতে
ভয় করে না কাকেও।
অজানা কোন পাখী
বাবুর বাড়ী ছেলে মেয়ের
ফেলে দেওয়া বই খাতা ফেলল এনে
ওই ছেলেটির কাছে।
ফুট ফুটে ওই ছেলেটি
কি করবে সে তো জানে না।
বই খাতা কখনও পায়ের তলে
কখনও বা মাথায়
এমনি করে খুঁজে কি যে পায়।
ওরই মনে আঁচড় কাটে
বই খাতারই পাতায়।

জনস্রোতে মিলিয়ে গেল—
কেউ জানে না তার জাত
পরিচয় থাকল শুধু—
মানুষ ছাড়া আর তো কিছু নয়

টেন না পশ্চাতে

এই সন্ধ্যাটুকু চাহে না কাটিতে
কতক্ষণে হবে তব আগমন, বড় একা
গঙ্গার ঐ পারে সূর্য্য ডুবে যায়
রেখেছিল মুখে মোর রক্তিম আভা—
যে যার বেসাতি নিয়ে অথবা জুঁই-এর মালা,
ফিরে যায় ঘরে।
আমার চাওয়া পড়ে আছে—গঙ্গার বুকে,
পড়ন্ত সূর্য্যের রোদ
আর ঢেউগুলি সোনা ছড়িয়ে চিক্‌মিক্‌ করে
সহস্র বৎসর ধরে করিতেছে খেলা।
আনন্দের কতটুকু পেলাম, জীবন ফুরিয়ে আসে।
কাঁটা ফোটা রক্ত ঝরা পদদ্বয়—
বুকভরা বেদনা ক্ষত, ফুস ফুস জরাজীর্ণ গতিস্তব্ধ
না, এখনও চলিতেছে অতি ধীরে
আকাশের পানে চাহি কিসের ভাবনা
সন্তর্পণে সন্ধ্যা এসে যায়।
নূতন দিনের আসিবে প্রভাত,
থাকিবে না কোন দুঃখ ব্যথা

প্রীতি প্রেম স্নেহ ভালবাসা টানিতে পারিবে না পশ্চাতে
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে অপরকে চেয়ে রহি।
নূতন দিগন্তের পারে কি আনন্দ—
'এই কথাটুকু দাও আজি'।

নীরবকর্মী

[১৯৩২ প্রেক্ষাপটে]

শৈশবের স্মৃতি হয়ত বা সব মনে করতে পারব না।
জিলা কংগ্রেসের অধিবেশন
আসছেন স্বনামধন্য অনেক নেতা।
গ্রামের খেলার মাঠে বিরাট প্রস্তুতি—
প্রায় ছয় মাস পূর্ব থেকেই।
এখন কলকাতায় অনেক মণ্ডপ দেখি।
কিন্তু সে দিনের সে মণ্ডপের মত হয়ত দেখি না,
বা শৈশবের এটাই বৃহৎ।
একদিকে স্বদেশী পণ্যের প্রদর্শনী
অন্যদিকে মুকুন্দ দাসের যাত্রার মঞ্চ।
বাইরের অতিথিদের থাকবার ব্যবস্থা
স্বেচ্ছাসেবক প্রায় ৩০০ উপরে হবে।
এ জেলার বিশিষ্ট নেতা দু-মাস আগে তদারক করে গেছেন।
এত স্বেচ্ছাসেবকের কোথায় থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা হবে?
সকলে নীরব, ভবতারণ বাবু বললেন, এরজন্য চিন্তার নাহিক কারণ
আমার গোলাভরা ধান আছে, ভাল ভাতের অভাব হবে না।
সকলে করতালি দিয়ে স্বাগত জানায়।
সত্যিই তুমি নীরব কর্মী।

বস্তা বস্তা ধান বাড়ী বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া।
যে যার মত চাল ঢেঁকিতে ভেনে
সে এক যজ্ঞ।
এক সঙ্গে এত লোকের পঙ্‌ক্তি ভোজন, হিন্দু মুসলমান—
খেয়ে উঠবার সময় সবার বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে
আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে।
আবার সন্ধ্যায়—একই।
আচার্য্যদেব আসবেন।
স্টীমার ঘাট থেকে মণ্ডপ পর্যন্ত হাজার হাজার মহিলার
শঙ্খ, উলুধ্বনি আর বন্দেমাতরম্।
স্বাধীন ভারত কি জয়॥
ভিড়ের মধ্যে আচার্য্যদেবকে দেখব বলে
প্রায় চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে কাছে যাই প্রণাম করি
কি নাম?
বাঃ বেশ ছেলেটি!
আমাকে প্রণাম করলে হবে না।
ভারতবর্ষ তোমার দেশ তাঁকে প্রণাম কর।
আর সকলকে আদর করে কোলে টেনে নাও,
তোমরা বড় হবে।

[১৯৪৭-এর একটি ঘটনা, চরিত্র কাল্পনিক]

বাবার মৃত্যু ওকে স্রোতের শ্যাওলা করে ভাসিয়ে দিল।
এত প্রাণ, এত প্রেরণা, কিন্তু সব শূন্য—জীবনে সে কখনও
অনুভব করে নি।

পথ চলবার ক্ষমতা নেই, তবু চলতে হবে।
সমস্ত পৃথিবীটা যেন অন্ধকার গোলকধাঁধা।
সে একটি মাত্র লোকের অভাব।
শুধু উদভ্রান্ত নয় দিগভ্রান্তও, পায়ের তলা থেকে মাটি
সরে গেছে। কিন্তু একটাই কথা—
বাবা মৃত্যুশয্যায় ওকে বুকে চেপে ধরে বলেছিলেন, তুমি
ব্যবসা করে বড় হবে —এই শেষ কথা।
পিতৃহারা সন্তান, সর্বশূন্য আজ।
ঐশ্বর্য যত তাঁর রইল পেছনে
আশীর্বাদ হল পাথেয়, হবে মূলধন -
এই বিশ্বাসে শূন্য হস্তে আরম্ভ হল দালালি।
ব্যবসায়ে এগিয়ে যাবার পথ যেমন দুস্তর তেমনি সাফল্যমণ্ডিত।
বড় সে হবেই।
একটু স্থানও হয়েছে।
অর্থের কৃচ্ছতা পূর্ণ হলেও মনের শূন্যতা কিছুতেই পূর্ণ হয় না।
বিবাহের সম্বন্ধ আসে বিভিন্ন জায়গা থেকে।
কিন্তু সব চিন্তায় যেন গোলমাল হয়ে যায়।
কে ওর আনন্দে আনন্দিত হবে?
তিনি নেই।
বাবার শেষ চিঠিতে লেখা ছিল তোমার বিয়ে দিয়ে যেতে পারলাম না।
ছেলে দেখে পছন্দ হলেও চাকচিক্যহীন ব্যবসা।
কন্যাপক্ষ কল্পনার আলো নিয়ে এসে নিরাশার
অন্ধকারে ফিরে যায়। এই আসা যাওয়া কোনোটাই মনে
দাগ কাটে না।
হঠাৎ এক পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা।
কুশল বিনিময়, একান্ত অনুরোধ ওদের বাড়ী যেতে হবে।
কিছু বিশেষ চিন্তা না করেই যায়

কতদিন বাদে এসেছ, রাতটা থাক—

এদিক ওদিক একটু তাকিয়ে, বলে "এই দুগ্ধ ফেননিভ

শয্যায় আমার নিদ্রার হবে না আগমন।

অতএব বিদায় বন্ধু।"

আর কবিত্ব করতে হবে না, আজ রাতটুকু থাক।

অঘটন ঘটল।

বন্ধুর পিতা ওকে কাতর অনুনয় করে বললেন, তাঁকে কন্যাদায়

থেকে মুক্তি দিতে হবে।

অনেকক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবে ওর সাথে এঁদের

ঐশ্বর্য্যের এত তফাত এত পার্থক্য—এ কি করে সম্ভব!

নিরুত্তর।

তুমি আমাকে কথা দাও।

আপনার অসম্মান আমি করতে পারি না, কোনো যৌতুক নয়,

ধান আর দূর্বা এই হবে আমার আশীর্বাদ।

বিবাহে যৌতুক নেওয়া আমার পিতৃদেবের নিষেধ,

বৃদ্ধের হাত দুটি স্খলিত হল ওর হাত থেকে—অসম্মান।

কিন্তু কেন এই বিবাহ?

রাত্রে ভাল ঘুম হল না।

অব্যক্ত এক চিন্তা, বাবার মুখখানা ভেসে ওঠে

তাঁর আত্মা শান্তি পাবে, তৃপ্ত হবে, আশীর্বাদ বড় হবে।

ভোর হতেই বেরিয়েপড়ে।

এত সকালে স্নান সেরে ফুল তুলে একটি মেয়ে, চোখ পড়তেই চলে যায়।

অনাড়ম্বর বিবাহ।

বিবাহের পর নতুন বরের আহার সমাপনে আঁচল দিয়ে

হাত মুছিয়ে দেওয়াই রীতি।

পেছন থেকে একজন চীৎকার করে বললেন, নতুন

বেনারসী কাপড়ের আঁচল দিয়ে ওর হাতটা মুছিয়ে দিলে,
কাপড়টা নষ্ট হয়ে গেল।

নববধূর চোখ দুটি লজ্জায় লাল।

পতিগৃহে যাত্রার সময় স-অশ্রু নয়নে কন্যার পিতা বলেছিলেন,

তোমাকে কি বলব, মেয়ে তোমাকে কখনও দেখেনি,

কিন্তু তোমাকে পাওয়ার জন্য কি ওর একাগ্রতা।

আজ শুভরাত। চতুর্দ্দিকে ফুলের গন্ধে আমোদিত।

প্রদীপের স্তিমিত আলো, রাত্রি দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত।

নববর, নববধূ।

মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে—'একটা প্রণাম করি?'

উঠে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন আদরে শুধু একটাই কথা—
তিন বছরের সাধনায় আজ আমার সিদ্ধিলাভ হল।

সাধনায় সিদ্ধিলাভ পরমানন্দ চরম প্রাপ্তি।

একি! তোমার চোখে জল?

আমাকে পেয়ে তুমি আনন্দ পাওনি?

দেখে পাওয়ার চেয়ে না দেখে পাওয়াই আনন্দ বেশী।

কিন্তু থাক সে কথা, আনন্দ যিনি পেতেন তিনি আজ নেই।

একটা গল্প বলব শুনবে? ব্রজ জ্যাঠার কথা মনে আছে?

ও কি! কথা বলছ না যে—বলে চিবুকটা ধরে নিজের
দিকে ঘুরিয়ে নেয়।

তোমাদের বাড়ীতে পূজো করতে এসে জ্যাঠার কাছে শিব ঠাকুরের
গল্প শুনি।

আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার কথা, বাবার কথা।

আমি জ্যাঠাকে বললাম, আমাকে ঐ শিবঠাকুর এনে দেবে
আমি পূজো করব।

কিন্তু পূজো করতে গিয়ে বিপদ।

ধ্যান করে শিবের মাথায় ফুল দিতে হয় স্বামীর কল্পনা করে।

তখন জ্যাঠার কাছে শোনা, তোমারই কল্পনা।
না দেখে তাহলে কিছু ভুল করিনি
এত সুন্দর কে হতে পারত!
দু হাত দিয়ে মুখটাকে উঁচু করে চোখের কাছে চোখ
নিয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে।
নববধূ জিজ্ঞাসা করে কি দেখছ? আমাকে?
তোমার ঐ সুন্দর চোখ দুটির ভেতর আমি নিজেকেই
দেখতে পাচ্ছি।
আরও একটু বুকের ভেতর চেপে ধরতেই বাইরের হালকা হাওয়া।...
ও ছোট বেলার ওর গল্প যত না জানে, বধূ তার থেকে অনেক
বেশী জানে।
গল্প, আরও কাছাকাছি দুজনকে আপন করে দেয়।
দ্বিরাগমনে আসতে হবে তারপরেই কর্মক্ষেত্রে।
কাল সকালেই যাত্রা।
'একটা কথা কাউকে বলবে না বল।' 'বল'
বাবার মৃত্যুশয্যায় আমি খবর পেয়েছিলাম, কিন্তু যাবার
উপায় না পেয়ে আমি চঞ্চল হই।
তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না আমি জ্যাঠাকে বলি
ওপারের বড়বাবু খুব অসুস্থ, একবার আমাকে দেখিয়ে
আনতে পারো?
সে তো অসম্ভব, বাবু তো রাজী হবেন না কিছুতেই।
তারপর।
আমার বাবাকে বললাম, চৈত্রমাস, বাসন্তীপুজো, ওপারের
মা কালীর বাড়ীতে পজা দিতে হবে,
ব্রজ জ্যাঠার সাথে যাব, ফিরতে বিলম্ব হতে পারে।
সেইমত ব্যবস্থা হল।

জ্যাঠাকে বললাম, উনি তো আমাকে চেনেন না, 'তুমি
পরিচয় দিও না।'

কি বলব মা! ওমন লক্ষ্মীপ্রতিমা, একি আমার ঘরে হয়!

জ্যাঠাকে পাঁচ টাকা দিতে রাজী, একটা সম্বন্ধ বের হল।

মাতৃহারা মেয়ে পুজো দিতে যাবে।

বাবা পুজোর জন্য খরচা দিলেন।

আমি ফল, খাবার নিয়ে বাড়ীতে গেলাম।

বাবার ঘরে যেতেই—উজ্জ্বল চাঁপা ফুলের মত রং, প্রশস্ত
কপাল, উন্নত নাক,

এমন দেব দুর্লভ দিব্য কান্তি।

আমি প্রণাম করতেই—

এ তুমি কাকে নিয়ে এসেছ ব্রজ?

জ্যাঠা বলে আমার আত্মীয়া, আপনি অসুস্থ আপনাকে
দেখতে এসেছে।

এত খাবার ফল!...

জ্যাঠাকে বললাম, একটা থালা নিয়ে এস আমি খাইয়ে দেব।

ও কি, তুমি পায়ের কাছে কেন? কাছে এসো, বসো।

ফল মিষ্টি খাইয়ে দিলাম।

বাবার কি আনন্দ।—তুমি কিছু খাবে না? বলেই

বাবা, লক্ষ্মীমা তুমি একটু খাও বলে আমাকে খাইয়ে দিলেন।

কে মেয়েটি ব্রজ, আমি তো চিনতে পারলাম না?

বাবা আমার হাতখানা টেনে নিয়ে নিজের বুকের উপর রাখলেন।

মেয়েটি বড় ভালো, ওকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না।

এসো, বলে কাছে টেনে নিয়ে সে কি স্নেহ।

আমাকে ফিরে আসতে হ'ল।

সেই আমার বাবাকে দেখা।

বার বার বললেন, মা আবার কবে আসবে?

আমার তো ওপারের ডাক এসেছে, আর বোধহয় দেখা হবে না।
সময় পেলে এসো।
কিছুতেই ছাড়তে চান না।
ইচ্ছা হচ্ছিল আমি থেকে শুশ্রুষা করি, সুস্থ করি, কিন্তু—
বাবা কাঁদতে থাকেন আর আমিও কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে
বেরিয়ে আসি।
বাবা তোমাকে দেখেছেন ?—অজান্তেই বাবার ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে গেছে !
কিছুদিন বাদে কলকাতা থেকে বাবার মৃত্যু সংবাদ পেলাম,
দশদিন নিরামিষ খেয়েছিলাম।
আজও কেউ জানে না, তুমিও কাউকে বলবে না।
আচ্ছা ঐশ্বর্য্য সম্পদের এত বৈষম্য,
এ তুমি কি করলে ?
আমার বাবা অন্য জায়গায় বিবাহের প্রস্তাব আনলেন।
আমি বলেছিলাম মন আমি ফিরিয়ে আনতে পারব না।
তোমাকে পাওয়াই তো আমার সব পাওয়া। আমার মনে আমি
পরিপূর্ণ।
কেউ আমাকে অসুখী করতে পারবে না।
কাল আমি তোমার সঙ্গেই যাব।
সে কি। সেখানে আট টাকা ঘর ভাড়া দিয়ে থাকি।
ছোটো ঘর বাসের অনুপযুক্ত, বস্তির কাছে।
আমি তো কিছুই বুঝছি না তুমি কি বলতে চাইছ ?
তোমার কষ্ট হবে সেখানে গেলে।
বাসার আবার ভালোমন্দ, ছোটো আর বড়।
আমাদের যখন বাড়ী হবে, সেটা যদি বড় হয় সেই সম্মান।
তুমি যদি কষ্ট সহ্য করতে পারো, আমি পারব না কেন ?
আমিও যাব।

তাই হল।

তৈজস পত্রের ভেতরে একটা টিনের বাক্স, আরাধ্য দেবতা শিবঠাকুর।
পিতৃস্নেহে অন্ধ বাড়ীর পুরোনো চাকর নেপাল সঙ্গে গেল।
ভয় হয় শৈশবে মা হারা বাবার এত আদরের ছেলেকে কি
আমি ভুলিয়ে রাখতে পারব?
একবার মনে আছে তোমার হয়েছিল ম্যালেরিয়া,
কত ইঞ্জেকশন কত ওষুধ, সারে না কিছুতেই।
তুমি বাবাকে বলেছিলে ও সবে কিছু হবে না, তুমি
আমাকে একটু পা ধোওয়া জল দাও, তাহলেই ভালো হব।
কোথায় পেলে এ সব গল্প?
বাবার আনন্দের গল্প, ব্রজ জ্যাঠার কাছে শুনেছি।
মৃত্যুশয্যায় শহরে নিয়ে আসবার আগে বাবা বলেছিলেন
বড় ডাক্তার আছে, চিকিৎসা হবে।
আর মৃত্যু হলে গঙ্গা পাব।
সে কি ব্যাপার! টাকার সুটকেশ নদীর জলে পড়ে গেল।
তুমি তুলে আনতে জলে ঝাঁপ দিলে, বাবা চীৎকার করে উঠলেন।
আমি জানি সবই।
ব্রজ জ্যাঠার গায়ে এমন সুন্দর কিসের গন্ধ?
গরমের ছুটিতে বড়বাবুর ছেলে এসেছে, বাবার জন্য
বালাখানার তামাক ৫ টাকা সের।
তার থেকে এক টান আমি চুরি করে খেয়ে এসেছি—
তার গন্ধ লুকোবে কোথায়?
বাবার কি আনন্দ, ছেলে কাছে না থাকলে ঘুম হয় না।
রাত্রে পা টিপে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বাবার ঘুম
পাড়িয়ে দেয়।
এই হয়েছে বড়বাবুর অভ্যাস।
ছেলে বটে।
দেখো নেপালের রান্না তুমি খেতে পারবে না

ভোর বেলা উঠে পূজোপাঠ সেরে তোমার রান্না করে দেব।
আর শিবঠাকুরের বেলপাতা দিয়ে দেব রোজ, কাজ হবে।
ভাবছ কেন?
অভাব তো মনের, দেহের কথা চিন্তা করি না।
রাত্রে বাড়ী ফিরেই বলে কাল কে আমাকে যেতে হবে
অনেক দূরে শহরের বাইরে সাতদিনের জন্য।
এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা তার বাবুদের অনেক কাজ করতে হবে।
আমাকে বায়না দিয়েছে।
এই নাও টাকা।
সাতদিন! এই রইল তোমার টাকা
একদিন ছেড়ে থাকতে পারি না, সাতদিন!
অনেক বুঝিয়ে রাজী হল।
চিন্তার বাইরে অকল্পনীয় সাফল্য।
ওকে ভদ্রলোক বহু টাকার কাজ দিলেন, বায়না করলেন।
সাতদিন বাদে ও সকালের গাড়ীতে বাড়ী ফেরে।
বেলা প্রায় দশটা বাজে।
ঘরে ঢুকে দেখে নিশ্চিন্ত মনে চণ্ডীপাঠ আর পূজো
ও ঢুকেই বলে আমি এসেছি।
এ'কদিনে এ কি চেহারা হয়েছে তোমার, খাওনি বুঝি কিছু?
খেতে তো খুব চেষ্টা করেছিলাম।
ঠাকুরের কাছে বসে কাঁদি আর বলি তুমি সুস্থ শরীরে ফিরে এসো।
তুমি ভালো আছ তো?
আমি তো ভালো আছি, কিন্তু তোমার কি চেহারা হয়েছে।
রাত্রে ঘুমোতে পারিনি।
খাওয়া দাওয়া কিছু করনি?
কখনও একেলা কিছু খেয়েছি যে খাব?
জানতুম।

নাও স্নান করে খাওয়া দাওয়া কর।

টাকাটা রাখ। 'এত টাকা?'

বসো আমি তেলটা মাখিয়ে দিই,

বুড়ো বয়স পর্যন্ত বাবা তোমাকে তেল না মাখালে তো চান

করতে পারতে না।

নাও খুব হয়েছে বসো এবার।

সরকারী একটা বড় চিঠি এসেছে।

অফিসের লোকটা কালই দিয়ে গেল।

খুলে দেখলাম টাকার অঙ্কটা অনেক বড়।

জানো তুমি বিদেশ থেকে মাল আনতে পারবে।

দেখি।

ব্যবসায়ে অগ্রগতি।

আনন্দে উচ্ছল জীবন এগিয়ে চলেছে।

বাসার পবিবর্তন চায় না, বাড়ী হলে হবে।

তা না হলে এই তো বেশ আছি।

একদিন রবিবাব দেখে চল না তীর্থ করে আসি।

বাবার শেষকৃত্য যেখানে হয়েছিল সেই গঙ্গার ধারে।

দ্বিধা না করেই ওরা চলে যায়।

কোন্ খানটায় দাহ হয়েছিল বল তো।

আমি জানি চিতাভস্মে তোমাদের জল দিতে হয় নি।

মা গঙ্গার জোয়ারের প্লাবন এসে বাবার চিতাকে ধুয়ে নিয়ে গেল।

তাই না?

দাও না ফুল আর বেলপাতা, বাবাকে একটু পুজো করে যাই—

বলেই মাটি তুলে দুজনে মাথায় দেয়।

ঘরটা ভালোই হয়েছে।

পা টা সরে যেতে হাতটা ধরে বললে, চল একবার

দক্ষিণেশ্বর মন্দির ঘুরে বাড়ী যাই।

পুজো দিয়ে ফেরবার পথে—
আমার কি মনে হয় জানো?
সবার উপরে শ্রেষ্ঠ হল বাবার কাজ চালিয়ে যাওয়া।
স্কুলের মাস্টার মশাইকে লিখে দাও বাড়ীতে দশজন
ছেলে থাকার ব্যবস্থা।
পুজোর সময়। 'বল কি বলছ'
ও বলে 'লক্ষ্মীর কাছে জগজ্জননী মহামায়ার আবির্ভাব,
আমাদের জীবনে এই প্রথম,
প্রাণ ভরে আনন্দ করবে এই তো!'
এবার পুজোয় লোককে কমপক্ষে পাঁচশ কাপড় দিতে হবে,
দু'মন চাল সেদ্ধ হওয়ার জন্য হাঁড়ি কিনতে হবে।
জন্মাষ্টমীতে আমি ভোগ রাঁধব।
'উপোস করে'?
তোমাকে পেতে আমাকে কম উপোস করতে হয় নি।
থাক্ বাড়ী গিয়ে ব্যবস্থা হবে।
নেপাল যদি রান্না করে থাকে তো খাওয়া যাবে না
একটু সন্দেশ কিনে খেয়ে নাও।
মেয়ের বিয়ের সময় সুরেশ হালদারের কাছ থেকে
হরেনবাবু কন্যাদায় থেকে মুক্ত হবার জন্য বসতবাড়ী
বন্ধক রেখে
পাঁচশ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন, তুমি ওদের ঋণমুক্ত করবে।
কি দেখছ? কতবড় প্রাণ! 'কতবড় লোকের পুত্রবধূ আমি,
এটা তাঁরই উপযুক্ত কথা'।
ধর তোমার এই চাওয়া পাওয়ার মধ্যে কোন অঘটন ঘটত
বা যদি ঘটে।
আগে না পেয়ে, আর এখন পেয়ে, কিন্তু আমি তোমার
মধ্যে চিরদিনই আছি এবং থাকবও।

এমনি করে সব কাজ এগিয়ে দেব।

চল সন্দেশ কিনে দি খেতে খেতে বাড়ী যাবে।

শরীর খারাপ।

মনে হয়েছিল হয়ত অত্যাধিক পরিশ্রমে।

কিন্তু, না।

ডাক্তার বললেন, সন্তানসম্ভবা, অল্পদিনের ভেতরেই।

আর বিলম্ব করা বোধহয় ঠিক হবে না।

সম্পূর্ণ একা।

এখানে কি করে কি সম্ভব? বোঝালেও যেতে চায় না

তবু ওকে ওর বাবার কাছে রেখে দিয়ে আসতে হল।

ব্যবসায়ের ব্যস্ততায় লোক মারফত যতটুকু খবর পায়।

হঠাৎ একদিন।

বিকেল পাঁচটার সময় যখন অফিস বন্ধ করবে,

ওদের গ্রামের লোক এসে বললে, দিদির ছেলে হয়েছে,

আপনাকে এক্ষুণি যেতে হবে।

বাসায় না গিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু ছটার পর আর কোন যানবাহন না থাকায় অসুবিধায় পড়ে।

বারো মাইল রাস্তা হেঁটে

রাত্রি দুটো।

নদীর ধার দিয়ে আসতে অন্ধকার রাত্রি আগুনের শিখায়

চতুর্দ্দিক উজ্জ্বলিত।

হঠাৎ একজন লোক এসে বললে, ওদিকে নয় এদিকে।

ওদিকে তো শ্মশান।

হ্যাঁ চলুন।

ও বুঝি চিতা জ্বলছে?

চলুন না।

কি হল?

দিদি নেই।

উন্মাদ হয়ে ও ছুটে যায় চিতার'পরে ঝাঁপ দিতে

চীৎকার করে বলে, ও কিছুতেই আমাকে ছেড়ে যেতে পারে না।

সবাই ধরে ফেলে।

কীর্তন আর হরিধ্বনির মধ্যে ওর আর্তনাদ মিলিয়ে যায়।

তখনও ওর সিঁথির সিঁদুর আর আগুনের শিখা দুই এক
হয়ে সমস্ত দিকটাকে লাল করে দিয়েছে।

ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল, অশ্রু গড়িয়ে পড়ে অবোরে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সেই একটিই কথা, না না না ও আমাকে
ছেড়ে কিছুতেই যেতে পারে না, পারবেনা।

প্রাণ চলে গেছে, ফিরে আসবে না কোনোদিন,
প্রেমটুকু তার নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে রবে চিরদিন।

আনন্দে উজ্জ্বল পরমানন্দে এক অপূর্ব পরিপূর্ণ প্রাণ
কোথাও চাওয়া নেই আছে দেওয়ার উচ্ছল আনন্দ।

হৃদয়ের অন্তস্থলে স্বচ্ছ সলিলে প্রস্ফুটিত হয়ে আছে
সহস্রদল পদ্ম এক অনিন্দ্যসুন্দর।

বরপণ

১৯৩৪-এর একটি ঘটনা অবলম্বনে পাত্র-পাত্রীরা
কাল্পনিক

না, না, না কিছুতেই না,—

চামার ছোটলোকের বাড়ীতে জলস্পর্শ করব না।

ছুঁড়ে ফেলে দিলেন খাদ্য-সামগ্রী ভরা আপ্যায়নের থালা।

রাত বারোটা বাজে......

বরযাত্রী প্রায় চারশ, খেয়ে চলে গেছে।

বহু রকমের পদ এবং মিষ্টান্ন, পরিতৃপ্ত !

স্বপ্নার বিয়ে, বিরাট আয়োজন।

কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান —জমিদারী।

শিক্ষার হয়নি প্রয়োজন।

সাতপাকের সময় একটু গুঞ্জন,......

চারভরি সোনার একটি গহনা থাকে অপূরণ।

রাশভারী জমিদার নৃসিংহবাবু,

জমিদারী ও কৌলীন্যের অর্থ অহংকার রক্ত টগ্‌বগিয়ে ফোটে।

নতুন বৈবাহিকতার আপ্যায়ণ, হল লাঞ্ছিত, পদদলিত।

চিন্তা ও দুঃস্বপ্নের ছায়া নেমে আসে কন্যার পিতার,

চারভরি স্বর্ণের অপ্রতুলতায়।

কন্যাকে করিবে না গ্রহণ—

বংশ মর্যাদা মহা মহোপাধ্যায় পিতৃদেব যাঁহার

চারভরি সোনার অভাবে,---একি অবিচার।

বুকফেটে যায়, আর চোখ দিয়ে টস্‌টস্‌ করে পড়ে জল,

—-স্থাণুর মত যেন হলেন অচল।

২২ বিঘে জমি বিক্রয়, দেওয়া হল দু-হাজার পণ,

পঞ্চাশ ভরির সোনার হল চারভরি কম।

এত বড় মিথ্যা! ওঁরা বলেছিলেন।

দেনা-পাওনা নিয়ে আত্মীয়ের সাথে হবে না বিরোধ এই আকাঙ্খায়।

কুশণ্ডিকায় সুকোমল পরাবে না সিঁদুর স্বপ্নার সিঁথিতে!

আত্মীয় পরিজন সব হতবাক; কোথা গেল ব্রাহ্মণের সম্মান ?

নৃসিংহবাবুর কুৎসিত গালাগালি আর চীৎকারে।

ধীর কন্ঠে কহিলেন,—

ঋণ পরিশোধ করিব নিশ্চয়,·—জলগ্রহণ করুন।

ভবিষ্যতের কথা নয়, আজ রাতেই।

তা নাহলে আপনার কন্যা রয়ে যাবে কাছে।

আত্মীয় স্বজন, ওঁর ছোট ছেলে,

বয়স,—বড় জোর ষোল।

পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলে,—

আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি

যদি ভবিষ্যতে মানুষ হতে পারি,

আপনার ঋণ করিব পরিশোধ।

চোখের জলে ওঁর পা দু'খানি ধুয়ে গেল!

পরদিন সকালে স্বপ্নার শাশুড়ি খবর পাঠান।

বুড়ো করতে পারে ভুল কিন্তু, আমি কভু নয়।

যেদিন ওরা দেনা শোধ করবে, সেদিন মেয়ে আসবে।

এতে বাকী বকেয়া চলে না,—এ জিনিসপত্তর কেনাবেচা নয়।

ছোটলোক-গুলোকে একথা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

অপমানের উপরে অপমান-- ।

স্বপ্নার ভাই বলে, আমি যাচ্ছি।

দেখে আসি ওঁরা কি বলেন।

যেতেই প্রায় বাড়ী থেকে বের করে দেওয়ার উপক্রম।

মিথ্যাবাদী জোচ্চোর কোথাকার,—

আমার ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে আমাদের সঙ্গে মিশতে এসেছিলে।

কাক কখনও হয় না ময়ূর।

আপনিতো সুকোমলের মা?

আমাকেও আপনার সন্তান মনে করুন।

আজ কুশণ্ডিকা,......

অগ্নিসাক্ষ্য করে সুকোমল, আমার বোনের মাথায় পরাবে সিঁদুর।

এ সময় আর বাধা দিবেন না।

আপনি একটু শান্ত হোন।

পাত্রের মাতার মন হইল নরম।

হুকুম হল এক কাপড়ে মেয়ে আসবে আর।—

আমার বাড়ী থেকে যে গহনা যাবে সেই গহনা পরে।—

হুকুম তো দিলেন মা, এবার নাকচ করে দিন।

আপনার দেনা আমি মাথায় নিয়ে যাচ্ছি।

যাওয়ার পথে একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে,

আমার একটা সোনার ঘড়ি আছে।

সেটা সুকোমল কাল হাতে পরে আসবে।

স্বপ্নার মাথায় সিঁদুর উঠল।

কুশণ্ডিকার অগ্নিদেবতা সেদিন স্বপ্নার কপালে

কি লিখেছিলেন জানি না।

বেলা গড়িয়ে আসল, স্বপ্না এবার যাবে—পালকী প্রস্তুত।

জিনিসপত্তর সব যাচ্ছে।

সুকান্ত স্বপ্নাকে জড়িয়ে ধরে কি কান্না।

জানে না,—

ভবিষ্যতে তার কত আনন্দ কত দুঃখ।

স্বপ্না শুধু বলে,—দাদা তুই যাস কিন্তু।

বেয়ারা পালকী উঁচু করল।

সুকান্ত মূর্চ্ছিত, বোধন বিল্ববৃক্ষ তলে